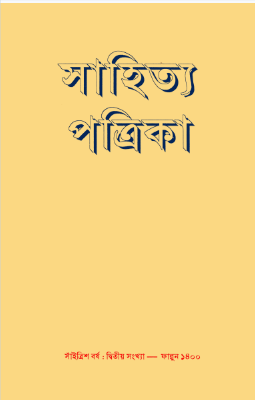

Vol. 37 | No. 2 | 1994

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি চিত্রণঃ পত্র ও কাব্যে

Volume	37
Issue	2
Year	1994
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মনোয়ারা হোসেন
Published online	February 1, 1994
DOI	10.62328/sp.v37i2.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v37i2.4
Pages	91-128
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৭ : সংখ্যা ২

Check for updates

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি চিত্রণঃ পত্র ও কাব্যে

মনোয়ারা হোসেন

বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের প্রেক্ষিতে পরিবর্তমান মানসিকতায় রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন, সেই ছবিগুলিই বিচ্ছিন্ন বা অবিচ্ছিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তার বিভিন্ন পর্যায়ের কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-চিত্র শুধু তত্ত্বসমৃদ্ধ নয়, তা তথ্য-সজীবও বটে। প্রাত্যহিক চোখে দেখা বৈচিত্র্যময় এই প্রকৃতির স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যের পর্যালোচনাই বর্তমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি সম্পর্কিত উপর্যুক্ত কবিতা পর্যালোচনায় লক্ষ করা যায় যে অকৃত্রিম প্রকৃতির চিত্র কখনো জীবন-বিচ্ছিন্ন, কখনো জীবনসম্পৃক্ত হয়ে ধরা পড়েছে তার কবিতায়। নিসর্গ বর্ণনার মধ্য দিয়ে বিচিত্র জীবনের বিন্যাসকে তুলে ধরেছেন কবি। ক্রমশ প্রকৃতির পরিপূর্ণ ঔজ্জ্বল্যের ভেতর যে অনুচ্চারিত, কুণ্ঠিত,অনতিস্ফুট দিকটি রয়েছে তার প্রতি আগ্রহী হয়েছেন তিনি।

রবীন্দ্র-মানসে যে-ভাব সঞ্চারিত হয়েছে, বাইরের বৃহৎ পৃথিবীর যে বস্তু, যে প্রকৃতি তার মনকে আচ্ছাদিত করেছে তার প্রতিফলন রয়েছে বিভিন্ন পত্রে। এই সব ভাবনা ও অভিজ্ঞতা কবির কাব্যে প্রতিফলিত হয়ে রবীন্দ্রকাব্যকে বিশিষ্ট করেছে। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার পূর্বাভাস বা সৌসাদৃশ্য রয়েছে বিভিন্ন সময়ে লেখা চিঠিপত্রে। দৃশ্যনির্ভর কল্পনা-প্রসূত যে বৈচিত্র্য রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে ধরা পড়েছে, তার কতিপয় সমান্তরাল রূপের দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থাপিত হল।

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শিল্পী বা সাহিত্যিক মাত্রই দেশ-কাল-সমাজ সম্পৃক্ত। সামাজিক অভিজ্ঞতার সাথে জীবনাভিজ্ঞতার মিশ্রণ শিল্পীমানসকে প্রভাবিত করে কবির দৃষ্টিভঙ্গিকে তাৎপর্যময় করে তোলে। রবীন্দ্রনাথও ব্যতিক্রম ছিলেন না। প্রকৃতি কবিকে কিভাবে কতটুকু প্রভাবিত করত সে প্রসঙ্গে *সোনার তরী* কাব্যের ভূমিকাটি উল্লেখযোগ্য :

> জীবনের বিশেষ পর্বে কোনো বিশেষ প্রকৃতির কাব্য কোন উত্তেজনায় স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দেখা দেয়, এ প্রশ্ন কবিকে জিজ্ঞাসা করলে তাকে বিপন্ন করা হয়। .... প্রাণের প্রবৃদ্ধিতে যে-সব পরিবর্তন ঘটতে থাকে তার ভিতরকার রহস্য সহজে ধরা পড়ে না।

কবি এখানেই উল্লেখ করেছেন যে *মানসী* কাব্যের অধিকাংশ কবিতা তিনি লিখেছেন পশ্চিমের এক শহরের বাংলাঘরে। নতুন স্পর্শ তাঁর মনের মধ্যে তখন এনেছিল নতুন স্বাদের উত্তেজনা। সেখানে অপরিচিতের নির্জন অবকাশে নতুনত্বের মধ্যে যে অসীমত্ব আছে তা উপলব্ধি করেছেন কবি। কিন্তু *সোনার তরী* লেখার পরিপ্রেক্ষিত ছিল ভিন্ন। বাংলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তখনকার নতুনত্ব ছিল চলন্ত বৈচিত্র্যের নতুনত্ব। কবির বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট হয় যে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের প্রেক্ষিতে পরিবর্তমান মানসিকতায় কবি প্রকৃতিকে যেভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন, সেই ছবিগুলিই বিচ্ছিন্ন বা অবিচ্ছিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন পর্যায়ের কবিতায়। বলা যায় রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-চিত্র শুধু তত্ত্বসমৃদ্ধ নয়, তা তথ্যসজীবও বটে। প্রাত্যহিক চোখে দেখা বৈচিত্র্যময় এই প্রকৃতির স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যের পর্যালোচনাই বর্তমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।

এক

রবীন্দ্র-প্রকৃতিকে বৈশিষ্ট্যময় করে তুলেছে বিভিন্ন প্রহর বা ঋতুর বৈচিত্র্য। দিন ও রাত্রির বিভিন্ন প্রহরে প্রকৃতির পরিবর্তনশীল খণ্ড রূপকে কবি সচেতনভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। 'সন্ধ্যা' বা 'রাত্রি'র বেশ কিছু চিত্র আছে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতায়। কখনো সে চিত্র গোধূলীর—রবি এখানে অস্তমিত; অরণ্যে অন্ধকার, বাতাস বিদায়-বিষাদ শ্রান্ত, আকাশে 'আলো' অম্লান। কখনো ছায়াময় ঘন বন বেষ্টিত 'দিঘি'র স্বচ্ছ গভীর জল সন্ধ্যার আলোকে উদ্ভাসিত। কোকিলের ডাক, কলসী কাঁখে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত বধূ যেখানে প্রকৃতির অংশরূপে বিধৃত। শৈশব সন্ধ্যার অবসাদগ্রস্ত বিষাদিত

প্রকৃতিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেছে গৃহপ্রত্যাগত রাখাল বালক। আখের খেত, কদলী, সুপারী আর বাঁশের বনে বেষ্টিত গ্রামের কোন 'গৃহপানে গেয়ে চলে যায় কোন রাখালের ছেলে'-যার নিশ্চিন্ত, নির্ভীক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর প্রকৃতিচিত্রণকে করেছে জীবনসম্পৃক্ত। একই সাথে আসন্ন সন্ধ্যার পরিবেষ্টন জাগ্রত করেছে কবির আনন্দ-বেদনায় পরিপ্লুত শৈশবস্মৃতি যেখানে নদীতীরে আম্রবনে, কাংসঘন্টা মুখরিত মন্দিরের ধারে শস্যক্ষেত্র প্রান্তে অথবা পুকুরের পাড়ে গৃহে গৃহে আনন্দের উচ্ছ্বাস, যেখানে সন্ধ্যাশয্যা আর দীপের আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মায়ের মুখ। 'আসন্ন সন্ধ্যা', 'গোধূলী' অথবা 'অতিক্রান্ত সন্ধ্যা' প্রায়শই কবিচিত্তকে আলোড়িত করেছে, বৃহত্তর অভিজ্ঞতার আলোকে ঋদ্ধ হয়েছে কবিমানস—যার পরিচয় রয়েছে *ছিন্নপত্রের* বিভিন্ন পত্রে। আসন্ন সন্ধ্যার দীপ্যমান বর্ণনা আছে *সোনার তরী* কাব্যের বেশ কিছু কবিতায় :

তখন যেতেছে অস্তে মলিন তপন।
আকাশ সোনার বর্ণ, সমুদ্র গলিত স্বর্ণ,
পশ্চিমদিগ্বধূ দেখে সোনার স্বপন।
[পরশ পাথর/*সোনার তরী*]

চিত্রটি সমুদ্রতীরবর্তী গোধূলীর। আকাশ এবং সমুদ্রে সূর্যরশ্মির প্রতিফলনে সমস্ত প্রকৃতি এখানে স্বর্ণময় হয়ে উঠেছে। এ ধরনের স্বর্ণগোধূলী 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতাটির প্রেক্ষাপটও নির্মাণ করেছে :

ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা,
ঝলিতেছে জল তরল অনল,
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল,
দিক্‌বধূ যেন ছলছল-আঁখি অশ্রু জলে,
[নিরুদ্দেশ যাত্রা/*সোনার তরী*]

বলাকার ৩৬ সংখ্যক কবিতায় সূর্যাস্তের দৃশ্য পল্লীবাংলার নয়, তা কাশ্মীরের ঝিলম নদীর তীরে সম্প্রসারিত। সেখানে সূর্যের সুবর্ণরশ্মি বিচ্ছুরিত ঝিলমের জলে। দীপ্র সন্ধ্যা অবসিত আসন্ন রাত্রির ম্লানতায়। অন্ধকার আকাশে অসংখ্য তারার দীপ্তি। গিরিতটে সারি সারি দেওদার তরুতে বিস্মৃত হয়েছে অন্ধকার। সন্ধ্যা বর্ণনায় কখনো গোধূলি কখনো সন্ধ্যা কখনো আসন্ন রাত্রির বর্ণনা রয়েছে। প্রেক্ষাপট নয় বাংলাদেশের গ্রাম, সমুদ্রতীরবর্তী প্রান্তর অথবা পার্বত্যঅঞ্চলের নদীতীর।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি প্রেক্ষাপট নির্মাণ করেছে বেশ কিছু কবিতার। কখনো এখানে সন্ধ্যা ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে আকাশে ম্লান চাঁদ—বৈশাখের শীর্ণ নদীর একদিকে ভাঙা পার, অন্যদিকে বালুকাময় তট। চন্দ্রালোকের শুভ্রতা আর বালুকার শুভ্রতা মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে; নদীতে ছোট নৌকা চলেছে ভরা পালে। একই চিত্রে প্রথম সন্ধ্যায় উদিত ম্লান চাঁদের বিলুপ্তি আর প্রকৃতির স্তব্ধতার মধ্য দিয়ে বিবর্তিত রাত্রির সমগ্রতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কখনো ছায়ায় সমাচ্ছন্ন ভাঙা চাঁদের আলো প্রকৃতিকে মায়াময় করে তুলেছে।

রবীন্দ্রকাব্যের প্রেক্ষাপট নির্মাণে সন্ধ্যা বা রাত্রির মত মধ্যাহ্নের ভূমিকাটিও তাৎপর্যপূর্ণ। মূলত শৈশব থেকেই মধ্যাহ্ন এবং মধ্যাহ্ন-প্রকৃতির অনুষঙ্গে প্রকৃতি সম্পৃক্ত জীবনের বিচিত্র ধ্বনি কবিচিত্তকে আলোড়িত করেছে—যার পরিচয় রয়েছে বিভিন্ন সময়ে লেখা চিঠি পত্রে। সোনালী রৌদ্রে ভরা দুপুর-যার অনুষঙ্গে রয়েছে রৌদ্রের উত্তাপ, নিস্তব্ধতা আর নির্জনতা, পাখিদের বিশেষত কাকের ডাক কবিকে উদাস এবং আকুল করে তোলে। এ ধরনের উজ্জ্বল, উত্তপ্ত আর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের বর্ণনা আছে *সোনার তরী* কাব্যের 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটিতে যেখানে ঝাঁ ঝাঁ করা 'নিস্তব্ধ নিঃঝুম' দ্বিপ্রহর 'রৌদ্রময়ী রাত্রি'র উপমায় তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এখানে 'জনশূন্য পল্লিপথে ধূলি উড়ে যায় মধ্যাহ্ন বাতাসে', 'স্নিগ্ধ অশথের ছায় ক্লান্ত বৃদ্ধা ভিখারিনী জীর্ণ বস্ত্র' পেতে সুপ্তিমগ্ন। গুঞ্জরিত আবেগ আর বিহ্বলতায় পরিপ্লুত মধ্যাহ্ন প্রেক্ষাপট নির্মাণ করেছে *খেয়া* কাব্যের 'নিরুদ্যম' কবিতাটিরও। এখানে মধ্যাহ্ন প্রকৃতির অনুষঙ্গে এসেছে কপোতের ডাক, পাখির গান, বাঁশির তান। মৌমাছির গুঞ্জন, বাঁশের ছায়া, আম্রমুকুলের গন্ধ আর রৌদ্রে ঘেরা শ্যামস্নিগ্ধতা-যেখানে বটের ছায়ায় রাখাল শিশু ঘুমে অচেতন। নির্জন স্তব্ধ মধ্যাহ্নের এই সব ডাকের মধ্য দিয়ে কবি বহির্বিশ্বের চলমানতার আনন্দ উপলব্ধি করেছেন। এই চিলের ডাক, ফেরিওয়ালাদের চিৎকার, ঘন্টার ধ্বনি বার বার এসেছে রবীন্দ্রকাব্যে, গল্পে, নাটকে, উপন্যাসের এক বিস্তৃত পরিসরে। সূর্যাস্তের মত সূর্যোদয় রবীন্দ্রকাব্য তথা তাঁর জীবনকে প্রভাবিত করলেও প্রভাতের বর্ণনা তুলনামূলকভাবে কম।

বিভিন্ন ঋতুর সমাবেশে রবীন্দ্রকাব্য বিচিত্র এবং বিশিষ্ট। *মানসী* কাব্যে শরতের পর্যাপ্তি এবং পরিপূর্ণতাকে প্রত্যক্ষ করা যায়, যা শরৎ ঋতুরই বৈশিষ্ট্য। *সোনার তরী* কাব্যের 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় শরৎ-প্রকৃতি অনেক বেশী দীপ্র। এখানে একই সাথে প্রকৃতির পরিপূর্ণতার পাশাপাশি প্রকৃতির ক্লান্তি আর বিষণ্ণতার মিশ্রণে প্রকৃতিচিত্রন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পূর্ববর্তী পর্যায়ের কাব্যে 'শীত' ঋতুর বর্ণনা থাকলেও তা তুলনামূলকভাবে পর্যাপ্ত নয়। *মানসী* কাব্যে 'বসন্ত' ঋতুর বর্ণনা আছে,

কিন্তু বৈচিত্র্য নেই। কপোত আর কোকিলের ডাক, নিবিড় শীতল তরুলতা অথবা অজস্র জ্যোৎস্না বা দখিনা বাতাস-এসবের সমন্বয়ে বসন্ত প্রকৃতির চিত্র গতানুগতিক। *চিত্রা* কাব্যের 'বসন্ত' বর্ণনায় চমৎকারিত্ব আছে :

ঝলিছে মেঘের আলো কনকের ত্রিশূলে,
দেউটি জ্বলিছে দূরে দেউলে।
শ্বেত পাথরেতে গড়া পথখানি ছায়া করা
ছেয়ে গেছে ঝরে-পড়া বকুলে।
[দিনশেষে/*চিত্রা*]

এখানে বসন্তসন্ধ্যায় মেঘ স্বর্ণময় আলোকে উজ্জ্বল। শ্বেতপাথরে গড়া পথ ঝরে পড়া বকুলে সমাকীর্ণ। সারিবদ্ধ নিকেতন, বেড়া দেওয়া উপবন আর মন্দিরে দীপ্যমান আলো প্রকৃতিকে মোহনীয় করেছে। আবেগে আবেশে আপ্লুত বসন্তের বর্ণনা আছে 'বিজয়িনী' কবিতায়। সেখানে প্রচ্ছায়াঘন বনে মূর্ছিত মধ্যাহ্নের জ্যোতি; লঘু স্বচ্ছ পূর্ণিমার আকাশের মতো পরিচ্ছন্ন অম্বর, পরিপূর্ণ সরসীর জল অনাহত স্থির। নির্জন তরুতলে ঝরে পড়া বিবশ বকুল, বনগন্ধে পূর্ণ শান্ত, উত্তপ্ত বাতাস, ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীর কলনৃত্য, শান্ত অকম্পিত চম্পকের ডালে কপোতদম্পতির বিহ্বল কূজন, কোকিলের অক্লান্ত বিফল কাকলি, রাজহংসের বলাকা বেঁধে দূর নদী সৈকত বিহার। ফুলে ফুলে গুঞ্জরিত ভ্রমর। তৃণাচ্ছাদিত তীরে মধ্যাহ্ন সমীরে নিদ্রিত সারস, ছায়াতলে সুপ্ত হরিণীর প্রতি বিমুগ্ধ মৃগের আসক্তি প্রকৃতি চিত্রণকে রমণীয় করে তুলেছে। বলাকা কাব্যের ১৩ সংখ্যক কবিতায় পউষের পাতা ঝরা তপোবনে বসন্ত বাতাসের আকস্মিক উন্মত্ত আবির্ভাব শীত ও বসন্ত ঋতু সন্ধিক্ষণের ইঙ্গিতবহ।

ঋতু বৈচিত্র্য, ঋতুর আবর্তন বিবর্তন রবীন্দ্রজীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। *জীবনস্মৃতি* গ্রন্থের 'বর্ষা ও শরৎ' অধ্যায়ে লক্ষ করা যায় যে জীবনের একটি পর্যায়ে 'বর্ষা ও শরৎ' তাঁকে মোহগ্রস্ত করেছিল। শরৎ-প্রকৃতি যে তাঁকে আবিষ্ট করেছে তার পরিচয় আমরা পেয়েছি। শরতের দীপ্র, স্বচ্ছ বর্ণনায় ঋদ্ধ তাঁর কাব্য এবং চিঠিপত্র। তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য যে 'বর্ষা' বর্ণনায় কবির আসক্তি ক্লান্তিহীন। বর্ষা-প্রকৃতির তপনহীন মধ্যাহ্নের প্রগাঢ় ছায়া, বনশ্রেণীর শ্যামলিমা অথবা অন্ধকারে পরিবৃত বিপর্যস্ত, বিশৃঙ্খল বর্ষণমুখর দিন কবির বিভিন্ন পত্রে ছড়িয়ে আছে। *সোনার তরীর* 'বর্ষাযাপন' কবিতাটিতে নগর প্রকৃতির বর্ষাকেই প্রত্যক্ষ করা যায়। লক্ষণীয় যে প্রবহমান আর্দ্র বায়ু, স্নিগ্ধ মেঘে আচ্ছন্ন আকাশ, ঘনশ্যাম অন্ধকার, বজ্রের রব, বিদ্যুতের আলো—গ্রামীণ অথবা নাগরিক বর্ষার সাধারণ

বৈশিষ্ট্য। তবে আলিসার আড়ে ভিজে কাক, জনহীন রাজপথ, চক্রের খড় খড় শব্দ বর্ষার প্রকৃতিচিত্রণে ভিন্ন মাত্রা যুক্ত করেছে। ঘোরালো হয়ে আসা বর্ষা অথবা ইন্দ্রের ঘোড়ার মত চিকমিকে বিদ্যুৎ—নগর প্রকৃতির বর্ষাকে তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে।

দুই

রবীন্দ্রনাথের উপর্যুক্ত প্রকৃতি সম্পর্কিত কবিতা পর্যালোচনায় লক্ষ করা যায় যে অকৃত্রিম প্রকৃতির চিত্র কখনো জীবন বিচ্ছিন্ন কখনো জীবন সম্পৃক্ত হয়ে ধরা পড়েছে তাঁর কবিতায়। জীবনের বিভ্রান্তিকে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন কখনো দীপ্র মধ্যাহ্নে যখন স্নিগ্ধ অশথের ছায়ায় ক্লান্ত বৃদ্ধা ভিখারিণী সুপ্তিমগ্ন, রাখাল শিশু ঘুমে অচেতন; অথবা কখনো রাত্রিতে যখন গ্রামের পথ-প্রান্তর জনহীন হয়ে যায়, কৃষিপল্লীর সমস্ত কলরব থেমে যায়, বৃদ্ধ কৃষাণের জীর্ণ কুটিরে দীপ্যমান সন্ধ্যাদীপটি যায় নিভে। জীবনের এই প্রশান্তির পাশাপাশি কর্মব্যস্ত জীবন কবিকে প্রলুব্ধ করেছে।

মানসী কাব্যে প্রকৃতি বর্ণনার অনুষঙ্গে কর্মময় মানুষের জীবনকে প্রকটভাবে না হলেও লক্ষ করা যায়। এখানে নিদ্রায় সুষুপ্ত দুপারের মাঝখান দিয়ে প্রবহমান গঙ্গার বুকে মাঝির বৃন্দাবনগাঁথা, বাঁধের জলরেখার তীরে জটলা করা রাখাল বালক, গৃহে প্রত্যাবৃত্ত তরী অথবা নদীতীরবর্তী কুটিরে স্তিমিত প্রদীপ কর্মময় জীবনেরই ইঙ্গিতবহ। *মানসী* পর্যায়ে প্রত্যক্ষভাবে চলমান জীবনকে কবি দেখেছেন গাজীপুরে ('কুহুধ্বনি'), সেখানে আছে শ্রান্তিহীন গান গেয়ে দুবোনের গমভাঙা, জল তোলার পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত বালিকা, নদীর মধ্যবর্তী চরে শস্যখেত প্রহরায় ব্যস্ত চাষি, উল্লসিত রাখাল বালক।

সোনার তরী কাব্যের প্রথম কবিতাটিতে যে তত্ত্বই থাকনা কেন মূলত এটি বর্ষণমুখর দিনে কর্মব্যস্ত কৃষক জাবনেরই ছবি। মেঘের গর্জন, ঘন বরষা, খরস্রোতা নদী, জলে পরিবেষ্টিত ক্ষেত, স্তূপীকৃত কাটা ধান, তরুচ্ছায়ায় গ্রাম-পদ্মাপারের জীবনকেই তুলে ধরে। 'আকাশের চাঁদ' কবিতাটিতে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন সাধারণ জীবনকে-যেখানে কর্মব্যস্ত জীবন, পারিবারিক জীবনের নিঃশঙ্ক আনন্দ উল্লাস, হাটে বাটে ধাবমান মানুষ-চলমান জীবনের পরিচায়ক। ক্ষেতে কৃষাণ পাকা ধান কাটায় ব্যস্ত, ছোটো ছোটো ভারী পাল তুলে চলেছে তরী, গান গাইছে মাটি, দূরে মন্দিরে বাজছে কাঁসর, ঘাটে যাচ্ছে বধূরা, মেঠো পথ দিয়ে গ্রামের হাটে চলেছে গৃহস্থ- এ সব কিছু নিয়েই গড়ে উঠেছে 'জীবনপূর্ণ সুন্দর লোকালয়' যা কবিকে আবিষ্ট করেছে। সাধারণ জীবনের প্রতি ক্লান্তিহীন আসক্তি নিয়ে কবি লক্ষ করেছেন ধূলি

উড়িয়ে ঘরে ফিরছে গাভী আর তরুঘেরা গ্রাম থেকে উদগত হচ্ছে ধূমলেখা ('বসুন্ধরা')। আর :

নদীর এপারে ঢালু তটে
চাষী করিতেছে চাষ ;
উড়ে চলিয়াছে হাঁস
ওপারের জনশূন্য তৃণশূন্য বালুতীরতলে।
[*বলাকা* ৪১]

নিসর্গ বর্ণনার মধ্য দিয়ে বিচিত্র জীবনের বিন্যাসকে তুলে ধরেছেন কবি। সমুদ্রতীরবর্তী পর্বতসংকটের গ্রামের জেলেদের জীবনযাত্রা কবিকে প্রলুব্ধ করেছে যেখানে :

... তীরে শুকাইছে জাল,
জলে ভাসিতেছে তরী, উড়িতেছে পাল,
জেলে ধরিতেছে মাছ ...
[বসুন্ধরা/ *সোনার তরী*]

কর্মব্যস্ত জীবনের প্রশান্তি কবিকে লোকালয়ের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছে। লোকনীড় প্রত্যাশী কবির মনে হয়েছে :

...সে নিভৃত
গিরিক্রোড়ে সুখাসীন ঊর্মিমুখরিত
লোকনীড়খানি হৃদয়ে বেষ্টিয়া ধরি
বাহুপাশে। ...
[ঐ]

এই প্রত্যাশাই কবিকে নিয়ে এসেছে পদ্মাতীরবর্তী গ্রামে যেখানে রয়েছে প্রচ্ছায় প্রচ্ছন্ন কুটির, সেখানে বাঁকা শীর্ণ গ্রামের পথটি শস্যখেতের পাশ দিয়ে প্রসারিত হয়ে জলের স্রোতে নেমে এসেছে যেখানে আকণ্ঠমগ্ন গ্রামবধূরা উচ্চ কৌতূকালাপে ব্যস্ত আর :

... বসি এক বাঁধা নৌকা'-পরি
বৃদ্ধ জেলে গাঁথে জাল নতশির করি
রৌদ্রে পিঠ দিয়া; উলঙ্গ বালক তার
আনন্দে, ঝাঁপায়ে জলে পড়ে বারম্বার
কলহাস্যে; ...

[সুখ/*চিত্রা*]

তীরবর্তী বন থেকে ভেসে আসছে আম্রমুকুলের গন্ধ, পাখির শ্রান্ত স্বর। নদীতীরে মাটিকাটায় ব্যস্ত পশ্চিমি মজুর (দিদি/ *চৈতালি*) বা বেদে রমণী (সঙ্গী/ *চৈতালী*) অথবা পশুশিশু আর নরশিশুকে একই স্নেহচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন করেছে যে দিদি-- (পরিচয়/ *চৈত্রালি*) তারা সবাই কর্মময় জীবনপ্রবাহের সাথেই যুক্ত।

তিন

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি সম্পর্কিত কবিতা পর্যালোচনায় লক্ষণীয় যে ক্রম। প্রকৃতির পরিপূর্ণ ঔজ্জ্বল্যের ভেতরে যে অনুচ্চারিত, কুণ্ঠিত, অনতিস্ফুট দিকটি রয়েছে তার প্রতি আগ্রহী হয়েছেন কবি। বয়স বৃদ্ধির সংকটকালে প্রকৃতির সুক্ষ্মতর বৈচিত্র্য, অবক্ষয় আর ধূসর দিকটির সঙ্গে মনের সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছেন তিনি। তাই রিক্ত, শীর্ণ, জটিলবর্ণ প্রকৃতির প্রতিচিত্রে আর আকিঞ্চন জীবনের তুচ্ছতায় আকীর্ণ তাঁর কাব্যের বিস্তৃত পরিসর। মূলত বাস্তবতা আর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির বিশিষ্টই কবির প্রকৃতিচিত্রণকে অর্থবহ করে তুলেছে। যতই কবির অভিজ্ঞতা বেড়েছে ততই তিনি প্রকৃতির অবক্ষয়িত, তুচ্ছ উপাদানগুলিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন—সাধারণের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন অখণ্ড কাব্যরস। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতে প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে ঝুরি নামানো একটি বটগাছ-যার পরিচয় রয়েছে রবীন্দ্রকাব্যের বিভিন্ন পর্যায়ে ; যেমন :

ভাঙা অতিথি শালা।
ফাটা ভিতে অশথ-বটে মেলেছে ডালপালা।

....

শুষ্কজল দিঘির পাড়ে জোনাক ফিরে ঝোঁপে ঝাড়ে
ভাঙা পথে বাঁশের শাখা ফেলে ভয়ের ছায়া।

[দিনশেষ/ *খেয়া*]

ক্রমশ পাঁচিল ভেঙে ওঠা অশথ (বধূ/*মানসী*) চাঁপা গাছের বাঁকা শাখা বা লতায় আকীর্ণ বেড়া (ব্যক্ত প্রেম/*মানসী*), কোকিলের ক্লান্ত ডাক, ধূসর আকাশে নীড়-প্রত্যাশী পাখি, শেওলা পিছল পৈঠা, রন্ধ্রবিহীন অন্ধকারে বকের ঝাঁকের শব্দ (দিঘি/*খেয়া*), কৃষ্ণপক্ষের আধখানা চাঁদের আলোর অস্বচ্ছতা (জাগরণ *খেয়া*), ঝরা ফুলের গন্ধ আর ঘনরাঙা রোয়ায় ঢাকা কুকুরছানা কবির কাছে অর্থবহ হয়ে উঠেছে। *পলাতকার* কবির চেতনাকে আবিষ্ট করেছে শৈশবে দেখা উপবাসীর মতো শীর্ণ ঘাসে আকীর্ণ প'ড়ো জমিটি যেখানে স্তূপীকৃত হয়ে আছে রান্নাঘরের ছাই আর পাড়ার জমে থাকা আবর্জনা! গোটাকয়েক আকন্দ গাছ ছাড়া আর কোনো গাছের অস্তিত্ব সেখানে নেই। কবি লক্ষ্য করেছেন সেই আবর্জনাময় আকীর্ণ প'ড়ো জমিতে :

দশ-বারোটা শালিখ পাখি
তুমুল ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে করত ডাকাডাকি;
দুপুরবেলায় ভাঙা গলায় কাকের দলে
কী যে প্রশ্ন হাঁকত শূন্যে কিসের কৌতূহলে।
[আসল/*পলাতকা*]

শালিখপাখির ঝগড়া, দুপুরে কাকের ভাঙা গলা প্রকৃতিকে চূর্ণবিচূর্ণ করেছে। এখানে গোটা কয়েক 'দশ-বারোটা'-ধরনের শব্দ প্রয়োগ নিদিষ্টতার ইঙ্গিতবহ। বাস্তব তুচ্ছ বস্তুর প্রতি আগ্রহী মন নিয়ে কবি অবলোকন করেছেন স্তূপীকৃত আবর্জনার তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুগুলিতে :

তেলের ভাঙা ক্যানেস্তারা, টুকরো হাঁড়ির কানা,
অনেক কালের জীর্ণ বেতের কেদারা একখানা,
ফুটো এনামেলের গেলাস, থিয়েটারের ছেঁড়া বিজ্ঞাপন,
মরচে-পড়া টিনের লণ্ঠন,
সিগারেটের শূন্য বাক্স, খোলা চিঠির খাম–
[আসল/*পলাতকা*]

বিপর্যস্ত প্রকৃতির বাস্তবতা *পরিশেষ* থেকে আরো প্রকট ও প্রত্যক্ষ। বৈশাখের আতপ্ত মধ্যাহ্নে বাঁশ আর খেঁজুর গাছের আলোড়ন, আন্দোলিত অশথ গাছের চিকন কচি পাতা আর বটের সুনিবিড় শ্যাম ছায়ায় ঘুমন্ত ঘুঘুর পাশাপাশি স্থান পেয়েছে

ক্লান্ত শীর্ণ, সংকুচিত বেলফুলের ম্লানগন্ধ, কলাগাছের দীর্ণপাতা আর শুকনো টগর, রুক্ষ কঠিন রক্তমাটির বক্রতা (আছি/*পরিশেষ*)।

'বালক'' কবিতাটিতে শৈশবের নিখাদ দুপুরে সিসুগাছের ডালপালা যখন ঝিলমিল করত, দূরের আকাশ বিদীর্ণ করত চিলের ডাক, তখনকার স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে তৃষ্ণার্ত কাকের প্রায়শ প্রাচীরের উপরে বসাকেই কবি স্মরণ করেননি, 'চঞ্চু' ফাঁক করাটিকেও তিনি তুলে ধরেছেন। গলির ওপারে ফেরিওয়ালার ডাক, দূরের ছাদে ঘুড়ি ওড়ানো কোনো অজ্ঞাত অপরিচিত বালক, ঘড়িওয়ালার ঘন্টা কবিকে আবিষ্ট করেছে। জীবন সায়াহ্নে এসে কবি আবার 'প্রখর তাপের কাল'কে নতুনভাবে অবলোকন করেছেন যেখানে :

> ঝরঝরিয়ে কেঁপে ওঠে শিরীষ গাছের ডাল,
> কুয়োর ধারে তেতুল-তলায় ঢুকে
> পাড়ার কুকুর ঘুমিয়ে পড়ে ভিজে মাটির স্নিগ্ধ পরশ-সুখে:
> গাড়ির গোরু ক্ষণকালের মুক্তি পেয়ে ক্লান্ত আছে শুয়ে
> জামের ছায়ায় তৃণবিহীন ভূঁয়ে।
> কাঁকর-পথের পারে
> শুকনো পাতার দৈন্য জমে গন্ধরাজের সারে।
>
> [বালক/*পরিশেষ*]

বালকদিনে কবির চেতনাকে আপ্লুত করেছিল তৃষ্ণার্ত কাক, চড়ুই, ফেরিওয়ালার ডাক, দূরের ছাতের ঘুড়ি ওড়ানো অপরিচিত বালক, ঘড়িওয়ালার ঘন্টা। প্রৌঢ় কবি লক্ষ করেছেন পাড়ার কুকুর, গাড়ির গরুর ক্ষণিক বিশ্রান্তি, কাঁকর পথের ধারে শুকনো পাতার দৈন্য।

পরিশেষ কাব্যের "কন্টিকারি" কবিতাটিতে রয়েছে শিলঙের পার্বত্য অঞ্চল। যেখানে খসে পড়া পাথরে অফলা পিচের শাখায় প্রস্ফুটিত ফুলের সমারোহ। কালো আর হলদের আভাস মেশানো ডানাওয়ালা পাখি, ফুলে পূর্ণ গোলাপলতা, পাইনবনের প্রাচীন তরু অথবা ডালিম গাছের ঘনসবুজ পাতার কোলে দোলায়মান গাঢ় রক্তিম ফুলের গুচ্ছের সাথে কবি কন্টিকারির হলুদ বিন্দু আঁকা নীলবর্ণের ফুলটিকে প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রকৃতির প্রাচুর্যের পাশে অনাদৃত কন্টিকারি ফুলকে স্থান দেবার মধ্যে কবির সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

ক্রমশ প্রকৃতির অনাবৃত জীর্ণতা আরো তীব্র হয়েছে :

সোঁদালের ডালের ডগায়
মাঝে-মাঝে পোকা-ধরা পাতাগুলি
কুঁকড়ে গিয়েছে;
বিলিতি নিমের
বাকলে লেগেছে উই;
কুরচির গুঁড়িটিতে পড়েছে ছুরির ক্ষত,
কে নিয়েছে ছাল কেটে;
চারা অশোকের
নিচেকার দুয়েকটা ডালে
শুকিয়ে পাতার আগা কালো হয়ে গেছে।
[আঘাত/*পরিশেষ*]

সোঁদালের ডালের ডগার পাতাগুলিতে পোকা ধরাই এখানে যথেষ্ট বিবেচিত হয়নি- তার 'কুঁকড়ে' যাওয়াটিও কবি লক্ষ করেছেন। বিলিতি নিমের বাকলে যে উঁই লেগেছে, কুরুচির গুড়িতে ছাল কেটে নেওয়ায় যে ক্ষতচিহ্ন, শুকিয়ে যাওয়া পাতার যে বিবর্ণতা তা কবির সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তিরই পরিচায়ক। এখানে 'ডালের ডগায়', 'পাতার আগা' 'নিচেকার দুয়েকটা' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার সুনির্দিষ্টতার চিহ্নবহ। প্রকৃতির জীর্ণতা আর দীনতা প্রকট হয়েছে 'আতঙ্ক' কবিতাটিতে :

ইঁটগুলো মাঝে মাঝে খসে গিয়ে
পড়ে আছে রাশ-করা।
গায়ে গায়ে লেগেছে অনন্তমূল,
কালমেঘ লতা,
বিছুটির-ঝাঁড়;
ভাঁটিগাছে হয়েছে জঙ্গল।
পুরোনো বটের পাশে
উঠেছে ভেরেণ্ডাগাছ মস্তবড়ো হয়ে।
[আতঙ্ক/*পরিশেষ*]

কৈশোর স্মৃতির অনুষঙ্গে বর্তমান প্রকৃতিকে অবলোকন করেছেন কবি। জটাবাধা বটের ছায়ায় বাগানের জীর্ণ প্রাচীরের সাদা-কালো দাগগুলো ভয়ংকরের প্রতীক হয়ে স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে। সতেরো বছর পরে জীর্ণ প্রাচীরে ক্ষয়ের

চিহ্নগুলি আরো প্রকট হয়ে উঠেছে। প্রাচীরের ইঁটগুলো খসে গিয়ে স্তূপীকৃত হয়ে আছে, সেই জরাজীর্ণ প্রাচীন প্রাচীর আচ্ছাদিত হয়েছে বিচিত্র অনাদৃত, উপেক্ষিত লতা আর ঝাঁড়ে। 'মস্তোবড়ো' শব্দটি একটিকে নির্দিষ্টতা অন্যদিকে 'উপেক্ষা'র ভাবটিকে ধারণ করেছে। নির্দিষ্টতাবাচক শব্দ ব্যবহারের প্রাচুর্য *পুনশ্চ* পরবর্তী কাব্যকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। 'পুনশ্চ' পূর্ববর্তী কাব্যেও এ ধরনের উদাহরণ আছে :

বেলা যখন আড়াইটে প্রায়, নিঝুম হ'ল পাড়া,
আর সকলে স্তব্ধ কেবল গোটা পাঁচেক চড়ুই পাখি ছাড়া
[*পরিশেষ*]

চার

রবীন্দ্রমানসে যে ভাব সঞ্চারিত হয়েছে, বাইরের বৃহৎ পৃথিবীর যে বস্তু যে প্রকৃতি তার মনকে আচ্ছাদিত করেছে তার প্রতিফলন রয়েছে বিভিন্ন পত্রে। মূলত এই সব ভাবনা, বাস্তব অভিজ্ঞতা অনেক ক্ষেত্রেই কবির কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে যা রবীন্দ্রকাব্যকে বিশিষ্ট করেছে।

সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে যে জীবনরস সঞ্চারিত, যে জীবনরসের কারণে মুকুল পরিণত হয় কুসুমে, তরুলতা গুল্ম সরস হয়ে ওঠে কবি সেই জীবন রসের সঞ্চারণ নিজের মনেও উপলব্ধি করেছেন। *ছিন্নপত্রাবলী*র ৭৪ সংখ্যক পত্রে কবি লিখেছেন :

প্রতিবার এই পদ্মার উপর আসবার আগে ভয় হয় আমার পদ্মা বোধ হয় পুরোনো হয়ে গেছে। কিন্তু, যখনই.... সৌন্দর্যের একটি নিত্য উৎসব উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়, তখন আবার নতুন করে আমার হৃদয় যেন অভিভূত হয়ে যায়। .... আমি বেশ মনে করতে পারি বহু যুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম, ... তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নবশিশুর মতো একটা অন্ধজীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম। এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান

করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্‌গত হত। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৬৩ : ১১৪ - ১৫]

সোনার তরী কাব্যের 'বসুন্ধরা' কবিতাটিতে একই ভাব লক্ষণীয় :

কোনোদিন আনমনে বসিয়া একাকী
পদ্মাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া মুগ্ধ আঁখি
সর্ব অঙ্গে সর্ব মনে অনুভব করি—
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে কেমনে শিহরি
উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর, তোমার অন্তরে
কী জীবনরসধারা অহর্নিশি ধ'রে
করিতেছে সঞ্চরণ, কুসুমমুকুল
কী অন্ধ আনন্দভরে ফুটিয়া আকুল
সুন্দর বৃন্তের মুখে, নব রৌদ্রোলোকে
তরুলতাতৃণগুল্ম কী গূঢ় পুলকে
কী মূঢ় প্রমোদরসে উঠে হরষিয়া।

ছিন্নপত্রাবলীর ১০৭ সংখ্যক পত্রে কবিতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কবি লিখেছেন :

সেই মন্দিরের কবিতার ঠিক অর্থটা কী ভালো মনে পড়ছে না। বোধ হয় সেটা সত্যিকার মন্দির সম্বন্ধে। ... বোধ হয় উড়িষ্যার মন্দিরগুলো দেখে দেখে আমার এই রকম একটা ভাব মনে এসে থাকবে [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৬৩: ১৬৫]।

তার মনে হয়েছে যে যখন কৃত্রিমতা দিয়ে দেবতাকে আচ্ছন্ন করে নিজের মনকে একটা অস্বাভাবিক সুতীব্র অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়, তখন হঠাৎ একটা সংশয়বজ্র পড়ে যদি সুদীর্ঘকালের কৃত্রিম প্রাচীর ভেঙে যায় তখন :

হঠাৎ প্রকৃতির শোভা, সূর্যের আলোক এবং বিশ্বজনের কল্লোলগান এসে আমার তন্ত্রমন্ত্র ধূপধুনার স্থান অধিকার করে এবং তখন দেখতে পাই সেই যথার্থ আরাধনা এবং তাতেই দেবতার তুষ্টি [ঐ]।

মূলত ভুবনেশ্বরের একটি ভীষণ অন্ধকার বদ্ধ মন্দিরের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত দেবতামূর্তি কবির মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তারই ফলে সৃষ্টি হয়েছে

সোনার তরী কাব্যের 'দেউল' কবিতাটি। *জীবনস্মৃতির* কারোয়ার অধ্যায়ে কবি লিখেছেন :

> এই ক্ষুদ্র শৈলমালাবেষ্টিত সমুদ্রের বন্দরটি এমন নিভৃত এমন প্রচ্ছন্ন যে, নগর এখানে নাগরীমূর্তি প্রকাশ করিতে পারে নাই।.... প্রশস্ত বালুতটের প্রান্তে বড়ো বড়ো ঝাউগাছের অরণ্য; সেই অরণ্যের এক সীমায় কালানদী নামে এক ক্ষুদ্র নদী তাহার দুই গিরিবন্ধুর উপকূলরেখার মাঝখান দিয়া সমুদ্রে আসিয়া মিশিয়াছে।.... আমরা তীরে নামিয়া একজন চাষার কুটিরে বেড়া-দেওয়া পরিষ্কার নিকানো আঙিনায় গিয়া উঠিলাম।

এখানে সমুদ্রের তটে নীলবর্ণ পর্বতসংকটে যে প্রাকৃতিক পরিবেশ, যে গ্রামের বর্ণনা কবি করেছেন তার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই *সোনার তরী* কাব্যের 'বসুন্ধরা' কবিতাটিতে :

> ... চারি দিকে শৈলমালা,
> মধ্যে নীল সরোবর নিস্তব্ধ নিরালা
> স্ফটিকনির্মল স্বচ্ছ; ...
> ... সমুদ্রের তটে
> ছোটো ছোটো নীলবর্ণ পর্বতসংকটে
> একখানি গ্রাম, ...

লক্ষণীয় যে বাইরের সমস্ত কিছুকে কবি আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছেন। জীবনের বিভিন্ন সময়ে অবলোকিত প্রকৃতিই প্রত্যাবৃত্ত হয়েছে পত্রে-কবিতায়। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র (৪ কার্তিক ১৩৩৯) থেকে অনুধাবন করা যায় যে 'বৈশাখ' কবিতাটির সঙ্গে মিশে আছে "শান্তিনিকেতনের রুদ্র মধ্যাহ্নের দীপ্তি।" কবিতাটি যেদিন তিনি লিখেছিলেন সেদিন বৈশাখের তপ্ত রূপ কবিকে আবিষ্ট করেছিল। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন ধূ ধূ করা মাঠ, ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর, নিঃশ্বসিত হয়ে ওঠা ঝাউগাছ আর দেখেছেন ছায়ামূর্তি অনুচরদের যারা "শুষ্ক রিক্ত দিগন্ত প্রসারিত মাঠের উপর দিয়ে ছুটে আসছে ঘূর্ণনৃত্যে ধুলোবালি শুকনো-পাতা উড়িয়ে দিয়ে।" এই রুদ্র প্রকৃতির অনুষঙ্গে গাছের মর্মর, পাখিদের কাকলি, দূর আকাশে চিলের ডাক, "ছায়াশূন্য রাঙামাটির রাস্তা দিয়ে মন্থরগমন ক্লান্ত গোরুর গাড়ির চাকার আর্ত স্বর" কবিকে আবিষ্ট করেছে। এ ধরনের মুখর রৌদ্রদীপ্ত প্রকৃতির চিত্র বিচ্ছিন্ন বা অবিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে তাঁর কাব্যে।

রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতাই বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত একটি পত্রে কবি *সোনার তরী* কবিতাটির প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, যেদিন কাঁচা ধানে বোঝাই ডিঙি নৌকা নিয়ে মগ্নপ্রায় চর থেকে চাষীরা এ পারে চলে আসছিল সেদিনই তাঁর মনে *সোনার তরী* কাব্যের সঞ্চার হয়েছিল। তিনি লিখেছেন :

> ছিলাম তখন পদ্মার বোটে। জলভারনত কালো মেঘ আকাশে, ও পারে ছায়াঘন তরুশ্রেণীর মধ্যে গ্রামগুলি, বর্ষার পরিপূর্ণ পদ্মা খরবেগে বয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে পাক খেয়ে ছুটেছে ফেনা। নদী অকালে কূল ছাপিয়ে চরের ধান দিনে দিনে ডুবিয়ে দিচ্ছে। কাঁচা-ধানে-বোঝাই চাষীদের ডিঙিনৌকা হুহু করে স্রোতের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৮৪ : ২১০]।

মূলতঃ "ভরা পদ্মার উপরকার ওই বাদল-দিনের ছবি" *সোনার তরী* কবিতার অন্তরে প্রচ্ছন্ন এবং তার ছন্দে প্রকাশিত।" কবি বীরেশ্বর গোস্বামীকে লিখিত একটি পত্রে *সোনার তরী* কবিতাটির তাৎপর্যকে ব্যাখ্যা করে তত্ত্ব প্রকাশ করেও উল্লেখ করেছেন:

> কিন্তু এ সমস্ত ব্যাখ্যাকে ধিক! কবিতার রস এই ব্যাখ্যার উপরেই যদি নির্ভর করে তবে ইহা বৃথাই লিখিত হইয়াছিল. মনে করো-না কোনোই বিশেষ অর্থ নাই; কেবল বর্ষা, নদীর চর, কেবল মেঘলা দিনের. ভাব একটা ছবি, একটা সংগীতমাত্রই যদি হয় তাহাতে ক্ষতি কী ?

সোনার তরী কাব্যের 'বিম্ববতী' কবিতা অথবা *চিত্রা* কাব্যের 'পূর্ণিমা' কবিতাটির পিছনেও ইতিহাস আছে। ভাইঝি অভির মুখে শোনা রূপকথার গল্পই স্থান পেয়েছে 'বিম্ববতী'তে। আবার 'পূর্ণিমা' কবিতাটিতে প্রতিফলিত হয়েছে একটি সন্ধ্যার ঘটনা– যা বিধৃত *ছিন্নপত্রে* : 'পত্র' এবং 'পূর্ণিমা' কবিতাটি পাশাপাশি তুলে ধরা হলো:

পত্র	কবিতা
সেদিন সন্ধ্যাবেলায়	পড়িতেছিলাম গ্রন্থ বসিয়া একেলা
একখানা ইংরেজি	সঙ্গীহীন প্রবাসের শূন্য সন্ধ্যাবেলা
সমালোচনার বই নিয়ে	করিবারে পরিপূর্ণ। পণ্ডিতের লেখা
কবিতা সৌন্দর্য আর্ট-	সমালোচনার তত্ত্ব; পড়ে হয় শেখা

প্রভৃতি ... নানা
কথার নানা তর্ক পড়া হচ্ছিল ....

এক এক সময় এই সমস্ত কথার
বাজে আলোচনা পড়তে পড়তে
শ্রান্তচিত্তে সমস্তই মরীচিকাবৎ
শূন্য বোধ হয়, এর বারো-আনা
কথা বানানো। সেদিন
পড়তে পড়তে মনটার
ভিতরে একটা নীরস শ্রান্তির
উদ্রেক হয়ে একটা
বিদ্রুপপরায়ণ সন্দেহ-শয়তানের
আবির্ভাব হল।

হঠাৎ যেন আমার চমক ভেঙে গেল।
আমার ক্ষুদ্র একরত্তি বাতির শিখা...
এই বিশ্বব্যাপী গভীর
প্রেমের অসীম আনন্দচ্ছটাকে
একেবারে আড়াল করে রেখেছিল।
নীরব গ্রন্থের বাক্যরাশির মধ্যে কী
খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম। সে কতক্ষণ থেকে
সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ করে
নিঃশব্দে বাইরে দাঁড়িয়েছিল।

সৌন্দর্য কাহারে বলে-আছে কী কী বীজ
কবিত্বকলায়। ...

... পড়ি পড়ি বহুক্ষণ
তাপিয়া উঠিল শির, শ্রান্ত হল মন-
মনে হল, সব মিথ্যা, কবিত্ব কল্পনা
সৌন্দর্য সুরুচি রস সকলই জল্পনা
লিপিবণিকের-অন্ধ গ্রন্থকীটগণ
বহু বর্ষ ধরি শুধু করিছে বচন
শব্দমরীচিকাজাল আকাশের 'পরে
অকর্ম-আলস্যাবেশে দুলিবার তরে
দীর্ঘ রাত্রিদিন। ...

হে সুন্দরী, হে প্রেয়সী, হে পূর্ণ পূর্ণিমা
... কখন দুয়ারে এসে
মুখানি বাড়ায়ে অভিসারিকার বেশে
আছিলে দাঁড়ায়ে এক প্রান্তে,...
... আমি গৃহকোণে
তর্কজালবিজড়িত ঘন বাক্যবনে
শুষ্কপত্রপরিকীর্ণ অক্ষরের পথে
একাকী ভ্রমিতেছিনু শূন্য মনোরথে
তোমারি সন্ধানে। ...

ছিন্নপত্রের ৭৪ সংখ্যক পত্রে কবি লিখেছেন :

> আমার বসুন্ধরা এখন 'একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য অঞ্চল' প'রে ঐ নদীতীরের শস্যক্ষেত্রে বসে আছেন। .... অনেক ছেলের মা যেমন অর্ধমনস্ক অথচ নিশ্চল সহিষ্ণুভাবে আপন শিশুদের আনাগোনার প্রতি তেমন দৃক্‌পাত করেন না- তেমনি আমার পৃথিবী এই দুপুর বেলায় ঐ আকাশপ্রান্তের দিকে চেয়ে বহু আদিম কালের কথা ভাবছেন [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৬৩ : ১১৫-১৬]।

এরই সাদৃশ্য রয়েছে *সোনার তরী* কাব্যের 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় :

... শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে

দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কুলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া; স্থির নয়নযুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন;...

এভাবে পর্যালোচনা করলে লক্ষ করা যাবে যে রবীন্দ্রকাব্যের অনেক কবিতার পূর্বাভাস বা সৌসাদৃশ্য রয়েছে বিভিন্ন সময়ে লেখা চিঠিপত্রে। উদাহরণের মধ্য দিয়ে ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট হয়। *ছিন্নপত্রে* কবি লিখেছেন :

বোটের জানলার কাছে চুপ করে বসে আছি, একটা জেলেডিঙিতে একজন মাঝি গান গাইতে গাইতে চলে গেল ... হঠাৎ মনে পড়ে গেল বহুকাল হল ছেলেবেলায় বাবামশায়ের সঙ্গে বোটে করে পদ্মায় আসছিলুম। একদিন রাত্তির প্রায় দুটোর সময় ঘুম ভেঙে যেতেই বোটের জানালাটা তুলে ধরে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম নিস্তরঙ্গ নদীর উপরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না হয়েছে। একটা ছোট্ট ডিঙিতে একজন ছোকরা একলা দাঁড় বেয়ে চলেছে। এমন মিষ্টি গলায় গান ধরেছে ।

উপর্যুক্ত পত্রের প্রতিফলন রয়েছে *আরোগ্য* কাব্যে :

মনে এল, কিছুই সে নয়, সেই বহুদিন আগে
দু-প্রহর রাতি
নৌকা বাঁধা গঙ্গার কিনারে।
জ্যোৎস্নায় চিক্কণ জল,
ঘনীভূত ছায়ামূর্তি নিষ্কম্প অরণ্য-তীরে-তীরে,
কদাচিৎ বনের ফাঁকে দেখা প্রদীপের শিখা।
সহসা উঠিনু জেগে।
শব্দশূন্য নিশীথ-আকাশে
উঠিছে গানের ধ্বনি তরুণ কণ্ঠের;
ছুটিছে ভাটির স্রোতে তন্বী নৌকা তরতর বেগে।
মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল -
[ঘন্টা বাজে দূরে। *আরোগ্য*]

পরবর্তী পর্যায়ের কয়েকটি কবিতা পর্যালোচনা করলে বা *ছিন্নপত্রের* সাথে মিলিয়ে পড়লেই অনুধাবন করা যাবে যে বাস্তব জীবনে কবি যা প্রত্যক্ষ করেছেন,

যা উপলব্ধি করেছেন তাই প্রতিফলিত হয়েছে, চিঠিপত্রে অথবা কবিতায়। *দেশ* পত্রিকার প্রকাশিত ১৮৪ সংখ্যক পত্র (৩০ আষাঢ় ১৩৬৮) এবং *পুনশ্চ* কাব্যের "ফাঁক" কবিতাটির তুলনা করা যাক :

কবিতা

আমার বয়সে
মনকে বলবার সময় এল-
কাজ নিয়ে কোরো না বাড়াবাড়ি,
ধীরে সুস্থে চলো,
যথোচিত পরিমাণে ভুলতে করো শুরু
যাতে ফাঁক পড়ে সময়ের মাঝে মাঝে।
বয়স যখন অল্প ছিল
কর্তব্যের বেড়ায় ফাঁক ছিল যেখানে সেখানে।
তখন যেমন-খুশির ব্রজধামে
ছিল বালগোপালের লীলা।
মথুরার পালা এল মাঝে,
কর্তব্যের রাজাসনে।

আজ আমার মন ফিরেছে
সেই কাজ-ভোলার অসাবধানে।
কী কী আছে দিনের দাবি
পাছে সেটা যাই এড়িয়ে
বন্ধু তার ফর্দ রেখে যায় টেবিলে।
ফর্দটাও দেখতে ভুলি,
টেবিলে এসেও বসা হয় না -
এমনিতরো ঢিলে অবস্থা।
গরম পড়েছে ফর্দে এটা না ধরলেও

পাখা কোথায়-
কোথায় দার্জিলিঙের টাইমটেবিল্‌টা

বেলা দুপুর,
আকাশ ঝাঁ ঝাঁ করছে,

পত্র

সত্তর বছর বয়সে মনকে বলবার সময় এসেছে, বাড়াবাড়ি কোরো না, ধীরে সুস্থে চলো, যথোচিত পরিমাণে ভুলতে শুরু করো, যাতে সময়ের মধ্যে অনেকটা করে ফাঁক পাওয়া যায়। বয়স যখন অল্প ছিল তখন এই-রকম ফাঁকের অভাব ছিল না, তখন-যথেচ্ছাচারের ব্রজধামে বাল–গোপালের লীলা ছিল–মাঝখানে মথুরার পালা কর্তব্যের রাজাসনে।

আবার ফিরেছি সেই সাবেক খেলার ক্ষেত্রে...কী কী কাজ বাকি আছে পাছে সেটা ভুলি অমিয় তার একটা ফর্দ টেবিলের উপর বিছিয়ে রেখে গেছে। কিন্তু ফর্দটাই দেখতে ভুলি, টেবিলে এসে বসাই হয় না। এই রকম অবস্থা। গরম পড়ে গেছে অত্যন্ত এ কথাটাও মনে আসতে পারত। ... পাখা কই ... দার্জিলিঙের টাইম টেবিলটা কোথায় ... বেলা দ্বিপ্রহর, আকাশ ঝাঁ ঝাঁ করছে, মাঠ ধু ধু করছে, তপ্তবালি হু হু করে উড়ে যায়- কিছুই খেয়াল হয় না। বনমালী মনে করে দরোজা বন্ধ করা ভদ্র

ধূ ধূ করছে মাঠ,
তপ্ত বালু উড়ে যায় হুহু করে –
খেয়াল হয় না।
বনমালী ভাবে, দরজা বন্ধ করাটা
ভদ্রঘরের কায়দা-
দিই তাকে এক ধমক।
পশ্চিমের শার্সির ভিতর দিয়ে
রোদ ছড়িয়ে পড়ে পায়ের কাছে।
বেলা যখন চারটে
বেহারা এসে খবর নেয়- চিট্‌ঠি!
হাত উলটিয়ে বলি-নাঃ!
ক্ষণকালের জন্য খটকা লাগে
চিঠি লেখা উচিত ছিল।
ক্ষণকালটা যায় পেরিয়ে,
ডাকের সময় যায় তার পিছন-পিছন।

প্রথা—দিই তাকে এক ধমক—
পশ্চিমের শার্সির ভিতর দিয়ে
রোদ্‌দুর ছড়িয়ে পড়ে পায়ের কাছে।
বেলা চারটে যখন, কখনো কখনো
কেউ এসে জিজ্ঞাসা করে—
চিঠি আছে? হাত উলটিয়ে
বলি— নাঃ। ক্ষণকালের জন্য মনে
হয়, হয়তো চিঠি লেখবার আছে—
সেই ক্ষণকালটুকু মুহূর্তে উত্তীর্ণ
হয়ে যায়, ডাকের সময়ও তার
পিছনে পছনে অন্তর্ধান করে।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৭৭ : ২০২]।

প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনার অনুষঙ্গে এসেছে প্রাকৃতিক পরিবেশ যা পত্রে প্রকাশিত :

এ দিকে বাগানের পথপ্রান্তে বেলফুলের অট্টহাসি, টগর গন্ধরাজের পুঁজি ফুরোতে চায় না, কাঞ্চন কুড়বি মধুমঞ্জরী বনপুলক কনকগৌরী এরা ঘাটে-জটলা-করা বধূদের মতো পরস্পর সম্ভাষণে আমার কুঞ্জবনটি মাতিয়ে তুলেছে আর কোকিল এমন করুণ ক্লান্তভাবে ডাকছে যে মনে হচ্ছে যে ডেকে কিছুই ফল হচ্ছে না অথচ আশা ছাড়তেও পারছে না [ঐ]।

একই চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে কবিতায় :

এ দিকে বাগানে পথের ধারে
টগর-গন্ধরাজের পুঁজি ফুরোয় না.
এরা ঘাটে-জটলা করা বউদের মতো
পরস্পর হাসাহাসি ঠেলাঠেলিতে
মাতিয়ে তুলেছে কুঞ্জ আমার।
কোকিল ডেকে ডেকে সারা ;

"ঘাটে-জটলা-করা বধূ" রবীন্দ্রমানসকে প্রভাবিত করেছিল যার পরিচয় রয়েছে *ছিন্নপত্রের* '৪১' সংখ্যক পত্রে :

... ঘাটে মেয়েরা কাপড় কাচছে, জল তুলছে, স্নান করছে, এবং উচ্চৈঃস্বরে বাঙাল ভাষায় হাস্যালাপ করছে – তাদের নিশ্চিন্ত উচ্চহাস্য শুনতে বেশ লাগে [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৬৩:৭৩]।

তৃতীয় খন্ড *চিঠিপত্রের* ৩৬ সংখ্যক পত্র এবং *পুনশ্চ* কাব্যের "বাসা" কবিতাটির তুলনা :

পত্র

থেকে থেকে মনে আসচে তোমার সেই স্টুডিয়োর কথাটা। ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে শালবনের ছায়ায়, খোলা জানলার কাছে। বাইরে একটা তাল গাছ খাড়া দাঁড়িয়ে, তারই পাতাগুলোর কম্পমান ছায়া সঙ্গে নিয়ে রোদ্দুর এসে পড়েছে আমার দেয়ালের উপর ; [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৭৭ : ২০২-৩]।

কবিতা

ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে
আমার পোষা হরিণে বাছুরে যেমন ভাব
তেমনি ভাব শালবনে আর মহুয়ায়।
ওদের পাতা ঝরছে গাছের তলায়,
উড়ে পড়ছে আমার জানলাতে।
তালগাছটা খাড়া দাঁড়িয়ে পূবের দিকে,
সকালবেলাকার বাঁকা রোদ্দুর
তারই চোরাই ছায়া ফেলে আমার দেয়ালে।

পত্র

নদীর ধার দিয়ে একটা ছায়াবীথি চলে গেছে–কুড়চি ফুলে ছেয়ে গেছে গাছ, বাতাবি নেবুর ফুলের গন্ধে বাতাস ঘন হয়ে উঠেছে, জারুল পলাশ মাদারে চলেচে প্রতিযোগিতা, সজনে ফুলের ঝুরি দুলচে হাওয়ায় ; অশথ গাছের পাতাগুলো ঝিল্‌মিল্ ঝিল্‌মিল্ করচে ; আমার জানলার কাছ পর্যন্ত উঠেছে চামেলিলতা ; [ঐ]।

কবিতা

নদীর ধারে ধারে পায়ে-চলা পথ
রাঙা মাটির উপর দিয়ে,
কুড়চির ফুল ঝরে তার ধুলোয় :
বাতাবিলেবু-ফুলের গন্ধ
ঘনিয়ে ধরে বাতাসকে।
জারুল পলাশ মাদারে চলেছে রেষারেষি,
সজনে ফুলের ঝুরি দুলছে হাওয়ায়,
চামেলি লতিয়ে গেছে বেড়ার গায়ে গায়ে
ময়ুরাক্ষী নদীর ধারে।

পত্র

নদীতে নেবেচে ছোটো একটি ঘাট, লাল পাথরে বাঁধানো; তারই এক পাশে একটি চাঁপার গাছ [ঐ]।

কবিতা

নদীতে নেমেছে ছোটো একটি ঘাট
লাল পাথরে বাঁধানো।
তারই এক পাশে অনেক কালের চাঁপাগাছ,
মোটা তার গুঁড়ি।

পত্র

নদীর উপরে দুটি সাঁকো থাকবে;... সেই সাঁকোর দুই প্রান্ত বেয়ে জুঁই বেল রজনীগন্ধা রক্তকরবী। নদীর মাঝে মাঝে গভীর জল : সেইখানে ভাসচে রাজহাঁস, আর ঢালু নদীতটে চরে বেড়াচ্চে আমার পাটল রঙের গাই গোরু তার বাছুর নিয়ে। [ঐ]।

কবিতা

নদীর উপরে বেঁধেছি একটি সাঁকো;
তার দুই পাশে কাঁচের টবে
জুঁই, বেল, রজনীগন্ধা, শ্বেতকবরী।

গভীর জল মাঝে মাঝে,
নীচে দেখা যায় নুড়িগুলি।
সেইখানে ভাসে রাজহংস,
আর ঢালুতটে চ'রে বেড়ায়
আমার পাটল রঙের গাইগোরুটি
আর মিশোল রঙের বাছুর
ময়ুরাক্ষী নদীর ধারে।

পত্র

শাক-সবজির ক্ষেত আছে, বিঘে দুইয়েক জমিতে ধানও কিছু হয় [ঐ]।

কবিতা

বাড়ির পিছন দিকটাতে
শাক-সবজির ক্ষেত।
বিঘেদুয়েক জমিতে হয় ধান।

'বাসা' কবিতাটিতেও প্রাত্যহিক জীবনাচরণের বর্ণনা আছে। সেখানে যে জাজিম পাতা মেঝে, কালো রেখার পাড় আঁকা বাসন্তী রঙের দেয়াল অথবা সূর্যোদয়ের আগেই যে তিনি পূর্বদিকের একটুখানি বারান্দায় এসে বসতেন এসবের অবিকল বর্ণনা আছে কবিতাটিতে। এরই অনুষঙ্গে এসেছে প্রাকৃতিক বর্ণনা আর সঙ্গে সঙ্গে এসেছে প্রকৃতিতে বিধৃত মানুষ—চলমান মানুষের কর্মপ্রবাহ যা তাকে আকৃষ্ট করেছে বার বার। প্রতিবেশিনী গাইতে গাইতে দই থেকে মাখন তোলে; তার স্বামী লাল টাট্টু ঘোড়ায় চ'ড়ে ক্ষেতের কাজ দেখতে যায়, নদীর ওপারের রাস্তা ছাড়িয়ে যে ঘন বন, যেখানে শীতকালে বেদেরা বাসা করে, সেখান থেকে ভেসে আসে সাঁওতালের বাঁশি। কবির মনে ভাদ্র মাসের মধ্যাহ্ন যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তার প্রতিফলন আছে *পথে ও পথের প্রান্তে* গ্রন্থের ৩৬-সংখ্যক পত্রটিতে :

প্লাটিনমের আঙটির মাঝখানে যেন হীরে-আকাশের দিগন্ত ঘিরে মেঘ জমেছে; তার মাঝখানের ফাঁক দিয়ে রোদ্দুর পড়েছে পরিপুষ্ট শ্যামল পৃথিবীর উপরে। আজ আর বৃষ্টি নেই-হুহু ক'রে হাওয়া দিচ্ছে, সামনে পেঁপে গাছের পাতা কাঁপছে, আরো দূরে--

আমার পঞ্চবটীর নিম গাছের ডালে ডালে চলছে আন্দোলন, আর তার পিছনে একা দাঁড়িয়ে আছে তালগাছ, তার মাথায় যেন বিস্তর বকুনি। বেলা এখন আড়াইটে।... আষাঢ় মাসের ম্লাননির্মল স্নিগ্ধ মধ্যাহ্নটি... দু দিকের খোলা জানালা দিয়ে আমার এই নির্জন ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৬৯ : ৭৫-৭৬]।

এরই সৌসাদৃশ্য রয়েছে *পুনশ্চ* কাব্যের 'সুন্দর' কবিতাটিতে:

প্লাটিন্যামের আঙটির মাঝখানে যেন হীরে।
আকাশের সীমা ঘিরে মেঘ,
মাঝখানের ফাঁক দিয়ে রোদ্দুর আসছে মাঠের উপর।
হূহু করে বইছে হাওয়া।
পেঁপে গাছগুলোর যেন আতঙ্ক লেগেছে,
উত্তরের মাঠে নিম গাছে বেধেছে বিদ্রোহ,
তাল গাছগুলোর মাথায় বিস্তর বকুনি।
বেলা এখন আড়াইটা।
ভিজে বনের ঝল্‌মলে মধ্যাহ্ন
উত্তর দক্ষিণের জানলা দিয়ে এসে জুড়ে বসেছে আমার সমস্ত মন।

মানসী পর্যায়ে কবি ছিলেন গাজীপুরে গঙ্গাতীরবর্তী বাংলোয়। এই অঞ্চলের প্রকৃতি প্রতিসৃত হয়েছে 'কুহুধ্বনি' কবিতাটিতে:

ছায়া মেলি সারি সারি স্তব্ধ আছে তিন চারি
সিসুগাছ পাণ্ডুকিশলয়,
নিম্ববৃক্ষ ঘনশাখা গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পে ঢাকা—
আম্রবন তাম্রফলময়।
গোলক-চাঁপার ফুলে গন্ধের হিল্লোল তুলে,
বন হতে আসে বাতায়নে।
ঝাউগাছ ছায়াহীন নিশ্বসিছে উদাসীন
শূন্যে চাহি আপনার মনে।
দূরান্ত প্রান্তর শুধু তপনে করিছে ধূ ধূ
বাঁকা পথ শুষ্ক তপ্তকায়া—

ছায়ায় কুটিরখানা দু ধারে বিছায়ে ডানা
পক্ষীসম করিছে বিরাজ--

কোথা হতে নিদ্রাহীন রৌদ্রদগ্ধ দীর্ঘ দিন
কোকিল গাহিছে কুহুস্বরে।

বাঁধা কূপ তরুতল, বালিকা তুলিছে জল
খরতাপে ম্লানমুখখানি।
দূরে নদী, মাঝে চর, বসিয়া মাচার 'পর
শস্যখেত আগলিছে চাষি।

....

দূরে তরী চলিয়াছে ভাসি।
[কুহুধ্বনি/*মানসী*]

মানসী কাব্যের 'সূচনা' অংশে উল্লেখিত গাজীপুরের প্রকৃতি সম্পর্কিত বর্ণনার সাথে 'কুহুধ্বনি' কবিতায় বিধৃত প্রকৃতির সাদৃশ্য লক্ষনীয় :

প্রায় মাইলখানেক চর পড়ে গেছে, সেখানে যবের ছোলার শর্ষের ক্ষেত; দূর থেকে দেখা যায় গঙ্গার জলধারা, গুণ-টানা নৌকো চলেছে মন্থর গতিতে। বাড়ির সংলগ্ন অনেকখানি জমি, অনাদৃত, বাংলাদেশের মাটি হলে জঙ্গল হয়ে উঠত। ইঁদারা থেকে পূর চলছে নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কলকল শব্দে। গোলক-চাঁপার ঘন পল্লব থেকে কোকিলের ডাক আসত রৌদ্রতপ্ত প্রহরের ক্লান্ত হাওয়ায়। পশ্চিম কোণে প্রাচীন একটা মহানিম গাছ, তার বিস্তীর্ণ ছায়াতলে বসবার জায়গা ; সাদা ধুলোর রাস্তা চলেছে বাড়ির গা ঘেঁষে, দূরে দেখা যায় খোলার-চাল-ওয়ালা পল্লী।

প্রসঙ্গতঃ *পুনশ্চ* কাব্যের 'স্মৃতি' কবিতাটি উল্লেখ্য। এখানে রাঢ় অঞ্চলের স্মৃতিচারণ করেছেন কবি। তাই *মানসী* পর্যায়ের অভিজ্ঞতা এখানে সক্রিয় :

পশ্চিমে শহর।

উত্তর দিকে সিসু গাছের তলা দিয়ে

চলেছে সাদামাটির রাস্তা, উড়ছে ধুলো,
খররৌদ্রের গায়ে হালকা উড়নির মতো।

....

সামনের চরে গম অড়র ফুটি তর্‌মুজের ক্ষেত,
দূরে ঝক্‌মক্ করছে গঙ্গা,
তার মাঝে মাঝে গুণ-টানা-নৌকা--

....

বারান্দায় রুপোর-কাঁকন-পরা ভজিয়া
গম ভাঙছে জাঁতায়,
গান গাইছে একঘেয়ে সুরে।

....

বুড়ো নিম গাছের তলায় ইঁদারা।
গোরু দিয়ে জল টেনে তোলে মালী;
তার কাকুধ্বনিতে মধ্যাহ্ন সকরুণ।
তার জলধারায় চঞ্চল ভুট্টার খেত।
গরম হাওয়ায় ঝাপসা গন্ধ আসছে আমের বোলের,
খবর আসছে মহানিমের মঞ্জরীতে মৌমাছির বসেছে মেলা।

তুলনীয় :

পশ্চিমের গঙ্গাতীর, শহরের শেষপ্রান্তে বাসা;
দূর প্রসারিত চর
শূন্য আকাশের নীচে শূন্যতার ভাষ্য করে যেন।
হেথা হোথা চরে গোরু শস্য শেষ বাজরার ক্ষেতে;
তরমুজের লতা হতে
ছাগল খেদায়ে রাখে কাঠি হাতে কৃষাণ বালক।

ইদাঁরায় টানা জল
নালা বেয়ে সারাদিন কুল্‌কুলু চলে
ভুট্টার ফসলে দিতে প্রাণ।
ভজিয়া জাঁতায় ভাঙে গম
পিতল-কাঁকন-পরা হাতে—

ছায়ায় কুটিরখানা দু ধারে বিছায়ে ডানা
পক্ষীসম করিছে বিরাজ–

কোথা হতে নিদ্রাহীন রৌদ্রদগ্ধ দীর্ঘ দিন
কোকিল গাহিছে কুহুস্বরে।

বাঁধা কূপ তরুতল, বালিকা তুলিছে জল
খরতাপে ম্লানমুখখানি।
দূরে নদী, মাঝে চর, বসিয়া মাচার 'পর
শস্যখেত আগলিছে চাষি।

....

দূরে তরী চলিয়াছে ভাসি।

[কুহুধ্বনি/*মানসী*]

মানসী কাব্যের 'সূচনা' অংশে উল্লেখিত গাজীপুরের প্রকৃতি সম্পর্কিত বর্ণনার সাথে 'কুহুধ্বনি' কবিতায় বিধৃত প্রকৃতির সাদৃশ্য লক্ষনীয় :

প্রায় মাইলখানেক চর পড়ে গেছে, সেখানে যবের ছোলার শর্ষের ক্ষেত; দূর থেকে দেখা যায় গঙ্গার জলধারা, গুণ-টানা নৌকো চলেছে মন্থর গতিতে। বাড়ির সংলগ্ন অনেকখানি জমি, অনাদৃত, বাংলাদেশের মাটি হলে জঙ্গল হয়ে উঠত। ইঁদারা থেকে পূর চলছে নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কলকল শব্দে। গোলক-চাঁপার ঘন পল্লব থেকে কোকিলের ডাক আসত রৌদ্রতপ্ত প্রহরের ক্লান্ত হাওয়ায়। পশ্চিম কোণে প্রাচীন একটা মহানিম গাছ, তার বিস্তীর্ণ ছায়াতলে বসবার জায়গা। সাদা ধুলোর রাস্তা চলেছে বাড়ির গা ঘেঁষে, দূরে দেখা যায় খোলার-চাল-ওয়ালা পল্লী।

প্রসঙ্গতঃ *পুনশ্চ* কাব্যের 'স্মৃতি' কবিতাটি উল্লেখ্য। এখানে রাঢ় অঞ্চলের স্মৃতিচারণ করেছেন কবি। তাই *মানসী* পর্যায়ের অভিজ্ঞতা এখানে সক্রিয় :

পশ্চিমে শহর।

উত্তর দিকে সিসু গাছের তলা দিয়ে

চলেছে সাদামাটির রাস্তা, উড়ছে ধুলো,
খররৌদ্রের গায়ে হালকা উড়নির মতো।

....

সামনের চরে গম অড়র ফুটি তর্‌মুজের ক্ষেত,
দূরে ঝক্‌মক্ করছে গঙ্গা,
তার মাঝে মাঝে গুণ-টানা-নৌকা--

....

বারান্দায় রুপোর-কাঁকন-পরা ভজিয়া
গম ভাঙছে জাঁতায়,
গান গাইছে একঘেয়ে সুরে।

....

বুড়ো নিম গাছের তলায় ইঁদারা।
গোরু দিয়ে জল টেনে তোলে মালী;
তার কাকুধ্বনিতে মধ্যাহ্ন সকরুণ।
তার জলধারায় চঞ্চল ভুট্টার খেত।
গরম হাওয়ায় ঝাপসা গন্ধ আসছে আমের বোলের,
খবর আসছে মহানিমের মঞ্জরীতে মৌমাছির বসেছে মেলা।

তুলনীয় :

পশ্চিমের গঙ্গাতীর, শহরের শেষপ্রান্তে বাসা;
দূর প্রসারিত চর
শূন্য আকাশের নীচে শূন্যতার ভাষ্য করে যেন।
হেথা হোথা চরে গোরু শস্য শেষ বাজরার ক্ষেতে;
তরমুজের লতা হতে
ছাগল খেদায়ে রাখে কাঠি হাতে কৃষাণ বালক।

ইঁদারায় টানা জল
নালা বেয়ে সারাদিন কুলুকুলু চলে
ভুট্টার ফসলে দিতে প্রাণ।
ভজিয়া জাঁতায় ভাঙে গম
পিতল-কাঁকন-পরা হাতে—

[ঘন্টা বাজে দূরে। *আরোগ্য*]

মুলত বিভিন্ন পত্রে প্রকৃতি সম্পর্কিত যে মনোভাব অথবা প্রকৃতির যে বর্ণনা প্রকাশিত হয়েছে তারই প্রতিরূপ রয়েছে রবীন্দ্রকাব্যের এক বিস্তৃত পরিসরে। নীচে আরো কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো :

পত্র	কবিতা
নদীতে স্রোত প্রায় নেই, শৈবাল ভাসছে তার থেকে এক রকম নতুন ধরনের সুগন্ধ আসছে। অথবা জলে শেওলা ভাসছে এবং তার থেকে একরকম গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে- চার দিকে জেলেদের বাঁশপোতা—জেলেদের জাল থেকে মাছ ছোঁ মেরে নেবার জন্য চিল উড়ছে, [রবীন্দ্রনাথ ১৯৬৩:৩৫]	তলায় পাতা ছড়িয়ে শেওলাগুলো দুলতে থাকে, [ছেলেটা/*পুনশ্চ*] অথবা ভিজে বাতাসে শ্যাওলার ঘন স্নিগ্ধগন্ধ। [চার/*শেষ সপ্তক*] অথবা পুকুর থেকে আসছে সেই পুরোনো কালের মিষ্টি গন্ধ শ্যাওলার; [কনি/*শ্যামলী*] অথবা বেলা দ্বিপ্রহর ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জর স্থির স্রোতোহীন। .... [মধ্যাহ্ন/*চৈতালি*] গাংচিল উড়ে বেড়াচ্ছে মাছধরা জালের উপরকার আকাশে [চার/*শেষ সপ্তক*] আকাশে উড়ে বেড়ায় শঙ্খচিল— বড়ো বড়ো বাঁশ পুতে জাল পেতেছে জেলে। বাঁশের ডগায় বসে আছে মাছরাঙা, [ছেলেটা/*পুনশ্চ*]
পাতিহাঁস জলের মধ্যে নেবে ক্রমাগত মাথা ডুবোচ্ছে এবং চঞ্চু দিয়ে পিঠের পালক সাফ করছে।	বিকেলের পড়ন্ত রোদে ঝিকিমিকি জলে ভেসে বেড়ায় পাঁতিহাসগুলো। পাখা সাফ করে ঠোঁট দিয়ে মেজে। [*পুনশ্চ*] অথবা অদূরে গ্রামের ঘাটে তুলি কলভাষ শুভ্র পক্ষ ধৌত করে সিক্ত চঞ্চুপুটে।

পাঁচটা ছটা বড়ো বড়ো
নৌকো সারি সারি বাঁধা

আছে, তার মধ্যে একটার
ছাতের উপর একজন
মাঝি আপাদমস্তক কাপড়
মুড়ে রোদ্দুরে নিদ্রা দিচ্ছে-
আর একটার উপর একজন
বসে বসে দড়ি পাকচ্ছে
এবং রোদ পোহাচ্ছে;

[মধ্যাহ্ন/*চৈতালি*]

মহাজনি নৌকোগুলো ঢালু তটে বাঁধা পাশাপাশি ;
মাল্লা বুনিতেছে জাল রৌদ্রে বসি চালের উপরে;

[ঘন্টা বাজে দূরে/*আরোগ্য*]

অন্যত্র-

... বসি এক বাঁধা নৌকা-'পরি
বৃদ্ধ জেলে গাঁথে জাল নতশির করি
রৌদ্রে পিঠ দিয়া।

[সুখ/' *চিত্রা*]

পলাতকা / *পরিশেষ* পর্যায়ের কাব্যে শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের উচ্চকিত বেশ কিছু কবিতা আছে যেখানে কবি অতীতে অবলোকিত প্রকৃতিকে, প্রকৃতি সম্পর্কিত জীবনকে স্মরণ করে বর্তমান প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করেছেন আরো গভীর অনুভূতি নিয়ে। উল্লেখ্য স্মৃতিচারণমূলক কবিতা *পুনশ্চ*-পরবর্তী কাব্যকে অর্থময় করে তুলেছে। *পরিশেষ* কাব্যের 'আরেক দিন' কবিতাটিতে তিরিশ বছর আগে পঁচিশ বছর বয়সের কবি যে অঞ্চলে এসেছিলেন সেখানে :

সূর্য যখন নেমে যেত নিচে
দিনের শেষে ওই পাহাড়ে পাইন-শাখার পিছে,
....
সামনেতে ঐ কাঁকর-ঢালা পথে
দিনের পরে দিনে
ডাক-পিয়নের পায়ের ধ্বনি নিত্য নিতেম চিনে।

[আরেক দিন/*পরিশেষ*]

এরই প্রতিচিত্র রয়েছে *পুনশ্চ* কাব্যের "স্মৃতি" কবিতাটিতে। জীবন সায়াহ্নে কবি একই প্রাকৃতিক পরিবেশে এসে লক্ষ করেছেন আগের মতই পাইনবনের শেষে একইভাবে সূর্য ডোবে, একইভাবে সন্ধ্যার ছায়া আর তারার আলো প্রসারিত হয় ঝরণার জলে-পর্বতে শুধু–

... কাঁকরঢালা পথে

বহুকালের চেনা

ডাক-পিয়নের পায়ের ধ্বনি একদিনও বাজবে না।

[ঐ]

এ ধরনের প্রগাঢ় উপলব্ধিতে সমৃদ্ধ হয়েছে কবির অভিজ্ঞতা। তাই কবির প্রকৃতি বর্ণনায় কখনো এসেছে ফসলের পরিপূর্ণতা, কখনো রিক্ততা আর শীর্ণতা যা পরস্পরবিরোধী নয় বরং একই প্রকৃতির-দু-দিক থেকে দেখতে পাওয়া ছবি, কবির প্রকৃতি বর্ণনাকে সমগ্র এবং সম্পূর্ণ করে তুলেছে।

বিভিন্ন ঋতুর উজ্জ্বল বর্ণনার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনায় প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে তাঁর ঐতিহ্যপ্রীতি। ইংরেজী কথাসাহিত্যে Hellenism বলে একটি কথা আছে যার অর্থ কবিদের পারিপার্শ্বিক থেকে কল্পনার জগতে অভিসার। কীটসের অভিসার ছিল প্রাচীন গ্রীক বা রোমান যুগে। রবীন্দ্রনাথের অভিসার কালিদাস অথবা জয়দেবে। প্রসঙ্গতঃ *মানসী* কাব্যের 'মেঘদূত' কবিতাটি উল্লেখ্য। কবিতার প্রথমেই কবি ঋণ স্বীকার করেছেন *মেঘদূতের* কবি কালিদাসের কাছে। এরপর কবি নিজের বাসভূমির উল্লেখ প্রসঙ্গে স্মরণ করেছেন *গীতগোবিন্দের* কবি জয়দেবকে :

মূলত বর্ষার দিনের অনুষঙ্গে কখনো এসেছে রাম-সীতার বিরহ প্রসঙ্গ, কখনো বৃন্দাবনে রাধিকার, কখনো বা যক্ষপ্রিয়ার। বর্ষার সাথে বিরহের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। পুরাকালে বর্ষা কর্মহীন ঋতু হিসেবে চিহ্নিত ছিল। কারণ এ সময়ে যুদ্ধ, বাণিজ্য বা যাতায়াত ছিল দুঃসাধ্য। বর্ষার সাথে বিরহের বিষয়টি আরো ঘনীভূত হয়েছে *মেঘদূত* কাব্যের মাধ্যমে। উল্লেখ্য যে বাল্মিকীর কাব্যেই প্রথম বিরহবেদনা উচ্চারিত হয়েছে। সীতাহরণের পরে সর্বভূতে সীতার প্রতিরূপ দেখার মুহূর্তটি *রামায়নের* তীব্রতম বেদনার মুহূর্ত। রামের সেই আকুলতার মধ্যেই বিরহব্যথা প্রথম উচ্চারিত হয়েছে। কালিদাসও *মেঘদূত* কাব্যের প্রথম শ্লোকে [বুদ্ধদেব বসু অনুদিত] বাল্মিকীর কাছে ঋণস্বীকার করেছেন সীতা প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে :

বাঁধলো বাসা রামগিরিতে তরুগণ স্নিগ্ধ ছায়া দেয় যেখানে,
এবং জলধারা জনকতনয়ার স্নানের স্মৃতি মেখে পুণ্য।

[*মেঘদূত*/শ্লোক-১]

কালিদাস বিরহী যক্ষের সাথে তুলনা করেছেন রামের আর সীতার সাথে যক্ষপ্রিয়ার। বার্তাবাহকের কাজ যক্ষের ক্ষেত্রে করেছে মেঘ, রামের ক্ষেত্রে

হনুমান।

শান্তিনিকেতন থেকে লেখা একপত্রে (২৪মে ১৮৯০) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *মেঘদূত* কবিতায় কালিদাসের প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে ঝড়, বৃষ্টি আর দুর্যোগ পরিবৃত দিনে রুদ্বার গৃহে তিনি কালিদাসের *মেঘদূত* পাঠ করেছেন এবং "সেটার উপরে ইনিয়ে বিনিময়ে বর্ষার উপযোগী একটা কবিতা লিখে ও" ফেলেছেন।

মূলত *মানসী* কাব্যের 'মেঘদূত' কবিতাটি কালিদাসের *মেঘদূত* কাব্যের অনুকরণ। কবিতাটির প্রেক্ষাপট নির্মাণ করেছে উজ্জয়িনী—প্রাচীন ভারতের একটি উজ্জ্বল নগরী। 'মেঘদূত' কবিতাটি কালিদাসের *মেঘদূত* কাব্যের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে বহু অংশ যে কালিদাসের অনুলিখন তা উপলব্ধি করা যায় :

কালিদাস	রবীন্দ্রনাথ
[১]	[১]
দেখবে নদী এক বিন্ধ্যশৈলের উপলবন্ধুর চরণে— হাতির গায়ে আঁকা চিত্রলেখা যেন শীর্ণ রেবা সেই বিসর্পিতা।	কোথা রহিয়াছে বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্যপদমূলে উপল ব্যথিত গতি

[শ্লোক ১৯/*মেঘদূত*]

[২]	[২]
তোমার আগমনে হবে দশার্ণেহ যাত্রী হংসের বিশ্রাম, সেখানে উদ্যানে কেতকী ফুটে উঠে পাণ্ডু ক'রে দেবে সাজানো বেড়া, গ্রামের পথে-পথে আকুল হবে তরু কাকের বাসা-বাঁধা ঝাপটে, পক্ক,পরিণত, প্রচুর জম্বুতে শ্যামল হবে বনপ্রান্ত। [শ্লোক ২৪]	বেত্রবতীকূলে পরিণত ফলশ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা। পথতরুশাখে কোথা গ্রাম বিহঙ্গেরা বর্ষায় বাঁধিছে নীড় কলরবে ঘিরে বনস্পতি :

প্রসঙ্গতঃ *ছিন্নপত্রাবলীর* ৮১ সংখ্যক পত্রটি উল্লেখ্য :

> উড়িষ্যার এই পথটা দেখে আমার ক্রমাগত কালিদাসের মেঘদূত মনে পড়ছিল। কেয়াগাছের-বেড়া-দেওয়া দশার্ণ গ্রামের কথা মেঘদূতে আছে, এখানেও অনেক গ্রাম কেয়ার-বেড়া-দেওয়া। বরাবর দিগন্তের ধারে ধারে নীলবর্ণ পাহাড় দেখা যাচ্ছে আর মেঘদূতে যাকে নগনদী ব'লে লেখা আছে, অর্থাৎ পাহাড়ে নদী, যে-সব নদীতে কেবল বর্ষাকালে পাহাড়ের জলস্রোত আসে, গ্রীষ্মকালে বালি এবং নুড়ি পড়ে থাকে, সেরকম নদী এখানে অনেক [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৬৩ : ১২৭]।

তুলনীয়

> ... এঁদের জাম্বুকুঞ্জের ফল পেকে আকাশের মেঘের মতো কালো হয়ে উঠেছেঃ দর্শান গ্রামের চতুর্দিকে কেয়াগাছের বেড়াগুলিতে ফুল ধরেছে ––
>
> [মেঘদূত প্রবন্ধ]

[৩]	[৩]
ভুলো না দেখে নিতে উজ্জয়িনীপুরে সৌধসমূহের উপরিতল; [শ্লোক ২৮]	কোথা শিপ্রানদীনীরে হেরে উজ্জয়িনী স্বমহিমচ্ছায়া, যেথা নিশিদ্বিপ্রহরে
বিরাম নিয়ো কোনো ভবন-বলভিতে, যেখানে কপোতেরা সুপ্ত [শ্লোক ৩৯]	প্রণয়াচাঞ্চল্য ভুলি ভবনশিখরে সুপ্ত পারাবত।

তুলনীয়

মেঘাচ্ছন্ন রাত্রে উজ্জয়িনীর গৃহস্থঘরের ছাদের নিচে পায়রাগুলি সমস্ত ঘুমিয়ে রয়েছে– [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৫১ : ২৩৯]।

[৪]	[৪]
ঐ যে হিমাচল, নিকটে কনখল, গা বেয়ে নামে তার গঙ্গা,	.... কোথা কন্‌খল

জহ্নু-দুহিতা সে, সগরবংশের স্বর্গযাত্রায়
যেন সোপান;
গৌরী তাকে যত ভ্রুকুটি করেছেন, তত সে
ফেনময় হাস্যে
ঢেউয়ের মুঠি তুলে ধরেছে শম্ভুর ইন্দু-জ্বলা
কেশগুচ্ছ।

যেথা সেই জহ্নুকন্যা যৌবনচঞ্চল
গৌরীর ভ্রুকুটি ভঙ্গী করি অবহেলা
ফেন পরিহাসচ্ছলে করিতেছে খেলা
লয়ে ধূর্জটির জটা চন্দ্রকরোজ্বল।

[শ্লোক ৫১]

'মেঘদূত' কবিতাটিতে 'আম্রকূট; 'অবন্তিপুরী', 'উজ্জয়িনী' 'কুরুক্ষেত্র', অথবা 'শিপ্রা', 'বেত্রবতী', 'নির্বিন্ধ্যা'র যে নাম পাওয়া যায় তা কালিদাস থেকেই আহরিত। নীচের উদাহরণগুলি লক্ষণীয় :

তোমার ধারাজলে ভীষণ দাবদাহ নিবলো যার, সেই আম্রকূট
[শ্লোক ১৭]
যাবে অবন্তীর পুরীতে, বৃদ্ধেরা যেখানে উদয়ন-কথাবিদ,
[শ্লোক ৩১]
ভুলো না দেখে নিতে উজ্জয়িনীপুরে সৌধসমূহের উপরিতল;,
[শ্লোক ২৮]
ব্রহ্মাবর্তের প্রথিত জনপদ, একদা যেথা কুরুক্ষেত্রে
[শ্লোক ৪৯]
তটের কলতানে রূপসী রমণীর ভুরুর ভঙ্গিমা যে দেয় এঁকে,
উর্মি-চঞ্চল বেত্রবতী সে-ই-করবে পান তার মধুর বারি।
[শ্লোক ২৫]
ফুল্ল কমলের গন্ধ মেখে সেথা শিপ্রাবায়ু বয় প্রভাতে,
[শ্লোক ৩২]
দেখবে যেতে যেতে স্খলিত, মনোরম ভঙ্গি নেয় নির্বিন্ধ্যা,
[শ্লোক ২৯]

'কালিদাসের কালে'র প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত যে জীবন তার প্রতিচ্ছায়াও 'মেঘদূত' কবিতাটিকে বৈশিষ্ট্যময় করে তুলেছে :

... কোন্ নদীতীরে

যূথীবনবিহারিণী বনাঙ্গনা ফিরে,
তপ্ত কপোলের তাপে ক্লান্ত কর্ণোৎপল
মেঘের ছায়ার লাগি হতেছে বিকল;

যে যূথীবনবিহারিণী বনাঙ্গনাদের কথা কবি বলেছেন যাদের তপ্ত কপোলের উত্তাপে ম্লান হয়েছে কর্ণোৎপল, মেঘের প্রচ্ছায়ের অভিলাষী যারা তাদের প্রতিচিত্র রয়েছে 'পূর্বমেঘ' এ :

... নদীতীরবর্তী
কাননে জলকণা ছিটিয়ে যেয়ো, মেঘ, তরুণ যুথিকার কোরকে;
কপোলে স্বেদ মুছে ক্লান্ত হ'লো যারা, মলিন হ'লো কানে পদ্মকলি,
আননে ছায়া ফেলে ক্ষণেক দেখে নিয়ো পুষ্পচায়িকা সে-মেয়েদের।
[শ্লোক ২৭]

মানসী কাব্যের 'মেঘদূত' কবিতার জনপদবধূ-যারা ভ্রূবিলাস শেখেনি, যারা আকাশে ঘনায়মান মেঘকে প্রত্যক্ষ করে তাদের প্রতিচিত্র রয়েছে কালিদাসের *মেঘদূত* কাব্যে :

জানে না ভ্রূবিলাস, নয়ম স্নেহময়, সরল জনপদবধূরা
তোমাতে নির্ভর কৃষির, তা-ই জেনে করবে দৃষ্টিতে তোমাকে পান।
[শ্লোক ১৬]

তুলনীয়

রেবা শিপ্রা বেত্রবতী গম্ভীরা নির্বিন্ধ্যা; চিত্রকূট আম্রকূট বিন্ধ্য; দশার্ণ বিদিশা অবন্তী উজ্জয়িনী; এদেরই সকলের উপরে নববর্ষার মেঘ উঠেছে; এদেরই যূথীবনে বৃষ্টি পড়ছে এবং জনপদবধূরা কৃষিফলের প্রত্যাশায় স্নিগ্ধনেত্রে মেঘের দিকে চাচ্ছে। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৫১ : ২৩৯]।

কালিদাসের *মেঘদূত* আর রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' থেকে আরো কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে :

মুক্ত বাতায়ন হতে যায় তারে দেখা
শয্যাপ্রান্তে লীনতনু ক্ষীণ শশীরেখা
পূর্বগগনের মূলে যেন অস্তপ্রায়!

[মেঘদূত/*মানসী*]

বিরহশয্যায় শুয়েছে একপাশে, শীর্ণ তনু মনোকষ্টে,
পূর্বাকাশে যেন কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের শেষ কলা উদিত,

[শ্লোক ৯২]

এ ধরনের বর্ণনা আছে *ছিন্নপত্রে*। সেখানে নদীর উপমা দিতে গিয়ে কবি যক্ষপত্মীর প্রসঙ্গ এনেছেন—এই বিস্তীর্ণ বালির ওপারে একটি প্রান্তে একটুখানি শীর্ণ স্ফটিকস্বচ্ছ জল ক্ষীণ স্রোতে বয়ে চলে যাচ্ছে। কালিদাসের *মেঘদূতে* বিরহিনীর বর্ণনায় আছে যক্ষপত্নী বিরহশয়নের একটি প্রান্তে লীন হয়ে আছে, যেন পূর্বদিকের শেষ সীমায় কৃষ্ণপক্ষের কৃশতম চাঁদটুকুর মতো। বর্ষাশেষের এই নদীটুকু দেখে বিরহিনীর আর একটা উপমা যেন দেখা যায়।

কালিদাসের কাব্যে 'উজ্জয়িনী' এবং 'অলকা'র বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে উজ্জয়িনী বাস্তব নগর কিন্তু অলকা কাল্পনিক স্বর্গরাজ্য যা মূলত উজ্জয়িনীর সৌসাদৃশ্যে নির্মিত। সুন্দরী রমণীতে সমাকীর্ণ উজ্জয়িনী যেখানে–

... বিরহবিকারে
রমণী বাহির হয় প্রেম-অভিসারে
সূচিভেদ্য অন্ধকারে রাজপথমাঝে
ক্বচিৎ বিদ্যুতালোকে; ...

[মেঘদূত/*মানসী*]

কালিদাসের অভিসারিকারাও প্রেমিকের ভবনে

চলেছে পুঞ্জিত আঁধার ঠেলে
বিজন রাজপথে, তামসী যামিনীতে, দৃষ্টিবিরহিত চরণে –
... স্নিগ্ধ বিদ্যুতে নিকষে কণকের ক্লান্তি এঁকে,

[শ্লোক ৩৮]

তুলনীয়

রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' প্রবন্ধ, রাজপথের অন্ধকার এমনি প্রগাঢ় যে, সূচী দিয়ে ভেদ করা যায়। কালিদাসের *মেঘদূত* কবিকে এমনভাবে আবিষ্ট, মোহগ্রস্ত করেছিল যে পরবর্তী পর্যায়েও তিনি তার আবেশ থেকে মুক্তি পাননি। প্রসঙ্গতঃ 'বিচ্ছেদ' কবিতাটি উল্লেখ্য :

যেদিন মেঘদূত লিখেছেন কবি,
সেদিন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে নীল পাহাড়ের গায়ে।
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটেছে মেঘ,
পূবে হাওয়া বয়েছে শ্যাম জম্বুবনান্তকে দুলিয়ে দিয়ে
যক্ষনারী বলে উঠেছে–
'মা গো, পাহাড়সুদ্ধ নিল বুঝি উড়িয়ে!'
[বিচ্ছেদ/*পুনশ্চ*]

এরই সৌসাদৃশ্য রয়েছে পূর্ববর্তী পর্যায়ের 'মেঘদূত' কবিতাটিতে :

কোন্ মেঘশ্যামশৈলে মুগ্ধ সিদ্ধাঙ্গনা
স্নিগ্ধ নবঘন হেরি আছিল উন্মনা
শিলাতলে, সহসা আসিতে মহা ঝড়
চকিত চকিত হয়ে ভয়ে জড়সড়
সম্বরি বসন ফিরে গুহাশ্রয় খুঁজি,
বলে, 'মা গো, গিরিশৃঙ্গ উড়াইল বুঝি।'
[মেঘদূত/*মানসী*]

তুলনীয়

মেঘদূত যেদিন লেখা হয়েছিল সেদিন পাহাড়ের উপর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। সেদিনকার নববর্ষায় আকাশে বাতাসে চলার কথাটাই ছিল বড়ো। দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটেছিল মেঘ, পূবে হাওয়া বয়েছিল, 'শ্যামজম্বুবনান্ত'কে দুলিয়ে দিয়ে; যক্ষনারী বলে উঠেছিল, 'মা গো, পাহাড় সুদ্ধ উড়িয়ে নিলে বুঝি!' [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৬৯ : ৮০-৮১]

পূর্ববর্তী পর্যায়ের মেঘদূতপ্রীতি পরবর্তী পর্যায়ের কাব্যেও যে প্রোজ্জ্বল তার কারণ অনুসন্ধান করা যায় ছিন্নপত্রাবলীর ৫৫ সংখ্যক পত্রটিতে :

মেঘদূত লেখার পর থেকে আষাঢ়ের প্রথম দিনটা একটা বিশেষ চিহ্নিত দিন হয়ে গেছে— নিদেন আমার পক্ষে। ...হাজার বৎসর পূর্বে কালিদাস সেই–যে আষাঢ়ের প্রথম দিনকে অভ্যর্থনা করেছিলেন এবং প্রকৃতির সেই রাজসভায় বসে অমর ছন্দে মানবের বিরহ-সংগীত গেয়েছিলেন, আমার জীবনেও প্রতি বৎসরে সেই আষাঢ়ের প্রথম দিন তার সমস্ত আকাশ-জোড়া ঐশ্বর্য নিয়ে উদয় হয়— সেই প্রাচীন উজ্জয়িনীর প্রাচীন কবির সেই বহু-বহু-কালের শত শত সুখ দুঃখ বিরহ মিলন -ময় নরনারীদের আষাঢ়স্য প্রথম দিবস [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর১৯৬৩ : ৯১]।

কল্পনা কাব্যের 'স্বপ্ন' কবিতাটির প্রেক্ষাপটও কালিদাসের কালে উজ্জয়িনীতে সম্প্রসারিত :

মহাকালমন্দিরের মাঝে
তখন গম্ভীর মন্দ্রে সন্ধ্যারতি বাজে।
জনশূন্য পণ্যবীথি–ঊর্ধ্বে যায় দেখা
অন্ধকার হর্ম্য-'পরে সন্ধ্যারশ্মিরেখা।'

এখানেও প্রধান্য পেয়েছে কবির ঐতিহ্যপ্রীতি। প্রিয়ার আবাসস্থল, তার ভবন, রমণীদের সজ্জা বর্ণনায় কবি কালিদাসের *মেঘদূতের* অনুসারী :

মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,
[*স্বপ্ন/কল্পনা*]

এরই প্রতিচিত্র রয়েছে 'উত্তরমেঘে' :

হস্তে ধৃত লীলাকমল, কুন্তলে কুন্দকলি বিন্যস্ত,
মুখের মধুরিমা লোধ্রপ্রসবের পরাগে হ'য়ে যায় পাণ্ডুর,
কর্ণে শোভা পায় শিরীষ মনোহর, তরুণ কুরুবকে কবরী,

[শ্লোক ৬৬]

লক্ষণীয় যে একই সময়ে বিভিন্ন ঋতুর ফুলে সজ্জিতা *মেঘদূতের* রমণীরা—শরতের ফুল পদ্ম, হেমন্তের কুন্দকলি, শীতের লোধ্র, বসন্তের কুরুবক, গ্রীষ্মের শিরীষ আর বর্ষার ফুল কদম্ব। এখানে কালিদাস বাল্মিকীর দ্বারা প্রভাবিত। দশরথের প্রাসাদে অনেক বৃক্ষই নিত্য পুষ্পফলপ্রসূ। লঙ্কার অশোকবনও সবঋতুর পুষ্পে পরিপূর্ণ ছিল। চৈত্রমাসে রামের অভিষেকের আয়োজন উপলক্ষে রাজপথ কমল আর উৎপলে আচ্ছাদিত ছিল।

কল্পনা কাব্যের "বর্ষাকালে" কবিতাটিতেও কালিদাসের *মেঘদূত* কাব্যের প্রভাব স্পষ্ট। বর্ষার অনুষঙ্গে ঐতিহ্যনুসারী উপাদানগুলিও এখানে উল্লিখিত হয়েছে। শশীতারাহীন অন্ধতামসী নিশি—অরণ্য আর বনবীথিকার আন্দোলন, ময়ুরের আকুলতা আর কেকারব, মত্ত দাদুরি, যুথীর গন্ধ—প্রাচীন ভারতের পরিবেশ থেকে আহরিত। স্নিগ্ধ সজল মেঘকরোজ্জ্বল দিবসে অলস প্রহরে জনহীন পথ, দীপ্ত দামিনী অভিসারের উপযুক্ত পরিবেশ নির্মাণ করেছে। বর্ষার অনুষঙ্গে এখানে এসেছে তড়িৎ-চকিত-নয়না জনপদবধূ, মালতীমালিনী আর অভিসারিকা। নব-অনুরাগীরা এখানে কুঞ্জকুটিরে ভূর্জপাতায় মেঘমল্লার-রাগিণীতে নতুন গীত রচনা করে। এখানে রমণীরা কেতকী কেশরে কেশ সুরভিত করে, তাদের ক্ষীণকটিতে কবরী, নয়নে অঞ্জন, তাদের শয্যা কদম্বরেণুতে আকীর্ণ।

বুদ্ধদেব বসু তার সম্পাদিত *মেঘদূত* কাব্যের ভূমিকায় 'স্বk¶' কবিতাটিকে বহুলাংশে কালিদাসের অনুলিখন বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে মেঘদূতের সাথে মিলিয়ে পড়লে ঐ কবিতার বিষয়, প্রতিটি স্বতন্ত্র তথ্য, এমনকি বহু ভাষাবিন্যাস যে *মেঘদূত* থেকে আহরিত তা নির্ধারণ করা যায়। সেখানে প্রিয়ার বাসস্থান হচ্ছে উজ্জয়িনী; তার সজ্জায় অলকার নারীদের সৌসাদৃশ্য, তার বাসগৃহ যক্ষভবনের অনুরূপ, আর আরতিমুখর সন্ধ্যালগ্ন হচ্ছে তাদের মিলনের কাল। তিনি উল্লেখ করেছেন :

> লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম, মহাকাল মন্দিরে সন্ধ্যারতি, দ্বারপার্শ্বে পুত্রবৎ-লালিত শিশু তরু ও শঙ্খপদ্ম-চিহ্ন কপোত, ময়ুর, চন্দন ও কেশধূপ—কবিতার আবহটিকে রবীন্দ্রনাথ সমগ্রভাবে 'মেঘদূত' থেকে তুলে নিয়েছেন [বুদ্ধদেব বসু : ১৯৬৩:৪৮]।

বর্ষা আর বিরহ প্রসঙ্গে প্রাচীন কাব্যে রাধিকার বিরহ প্রসঙ্গটিও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। জয়দেবের *গীতগোবিন্দের* প্রথম পংক্তিটি ছিল– *"মেঘৈর্মেদুর মম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ।"*

উজ্জয়িনীর মেয়েদের মতো জয়দেবের রাধিকাও বর্ষার রাত্রে অভিসারিণী। মূলত বাল্মিকী থেকে কালিদাস, জয়দেব থেকে চণ্ডীদাস আর রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বর্ষার সাথে বিরহের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই বর্ষণমুখর প্রকৃতি যখন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যায় প্রাচীন ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশে তখনই যক্ষবধূ এবং রাধা তাঁকে আলোড়িত করে। প্রসঙ্গত *মানসী* কাব্যের "পত্র" অথবা *সোনার তরী* কাব্যের 'বর্ষাযাপন' কবিতা দুটি উল্লেখ্য।

মানসী কাব্যের 'একাল ও সেকাল' কবিতাটিতে স্থান পেয়েছে রাধিকার দিবা অভিসার, বৃন্দাবন, কদম্বের মূল, যমুনার তীর আর শিখীর নৃত্য; মূলত কবিতার আবহটিকে রবীন্দ্রনাথ সামগ্রিকভাবে বৈষ্ণব কাব্য থেকেই আহরণ করেছেন। এখানে বর্ষার দুর্যোগপূর্ণ বর্ণনা নেই; বরং গাঢ় ছায়ায় পরিবৃত তপনহীন মধ্যাহ্নের শ্যামল প্রাকৃত পরিবেশে একটা বিহ্বলতা প্রচ্ছন্ন যা মানুষের হৃদয়কে অচল করে না বরং চেতনালোককে উদ্ভাসিত করে; বর্তমান বর্ষায় প্রচ্ছায় কবি প্রত্যক্ষ করেন রাধিকার অভিসারের মুহূর্তটিকে, কারণ :

সেদিনও এমনি বায়ু রহিয়া রহিয়া
এমন অশ্রান্ত বৃষ্টি,
তড়িত-চকিত দৃষ্টি,
এমনি কাতর হয়ে রমণীর হিয়া।
[একাল ও সেকাল/*মানসী*]

কবি বর্তমান বর্ষার মধ্য দিয়ে অনাদিকালের বর্ষা আর বর্ষার অনুষঙ্গী বিরহবেদনাকে উপলব্ধি করেছেন। তাই এখানে যক্ষনারীর বিরহবেদনার সমসূত্রে গ্রথিত হয়েছে রাধিকার বিরহজাত উপলব্ধি।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনায় ঐতিহ্য প্রসঙ্গে *মানসী* কাব্যের "কুহুধ্বনি" কবিতাটি উল্লেখ করা যায় যার প্রেক্ষাপট নির্মাণ করেছে বসন্ত। মূলত বসন্তকালীন প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিপূর্ণতা একদিকে মানুষের মিলনের অভিলাষকে জাগ্রত করে, অন্যদিকে বিচ্ছেদজাত বেদনার আবেগকে করে প্রগাঢ়। তাই যে কুহুধ্বনি

প্রচ্ছায়তমসাতীরে সীতাকে উন্মনা করে, সেই একই কুহুধ্বনি বিজনে লতাকুঞ্জে দুস্মন্ত এবং শকুন্তলার মিলনকে করে রমণীয়।

দৃশ্যনির্ভর কল্পনাপ্রসূত যে বৈচিত্র্য রবীন্দ্র সৃষ্টিতে ধরা পড়েছে, তার কতিপয় সমান্তরাল রূপের দৃষ্টান্ত আলোচ্য প্রবন্ধে কবিতা ও গদ্য রচনা থেকে দেওয়া হল। এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির অভিন্ন রূপের বিচিত্র প্রকাশ আরো স্পষ্ট হবে। রবীন্দ্রনাথের নিজের চোখে বা মহাকবি কালিদাসের দৃষ্টিতে প্রকৃতির বর্তমান বা অতীত রূপের যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্র রবীন্দ্রনাথ অংকন করেছেন তা থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনার স্বরূপও উপলব্ধি করা যায়। প্রকৃতির উপর স্বরূপ আরোপ নয়, প্রকৃতি নিয়ে তত্ত্ব নয়, সহজভাবে বিভিন্ন সময়ে দেখা প্রকৃতি কখনো কবিতায়, কখনো চিঠিপত্রে, কখনো স্মৃতিকথায়, কখনো গানে ধরা পড়েছে - যা হয়তো কবি সর্বদা সচেতনভাবে করেননি। কিন্তু কবির সচেতন বা অচেতন অনুভূতিতে বা স্মৃতিতে প্রকৃতি যে ছাপ ফেলেছে তা বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশিত হয়েছে।।

গ্রন্থপঞ্জি

বুদ্ধদেব বসু ১৯৬৩ — *কালিদাসের মেঘদূত।* কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯৬৩ — *ছিন্নপত্রাবলী।* কলকাতা : বিশ্বভারতী।

১৩৮৪ — *সোনার তরী।* কলকাতা : বিশ্বভারতী।

১৩৭৭ — *পুনশ্চ।* কলকাতা : বিশ্বভারতী।

১৯৬৯ — *পথে ও পথের প্রান্তে।* কলকাতা : বিশ্বভারতী।

১৩৫১ — *মানসী।* কলকাতা : বিশ্বভারতী।